সুধা

ক্ষুধা

মহাশ্বেতা দেবী

পরিবেশক :
প্রকাশক ॥ ৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়
রায়পুর, বিড়লাপুর,
দক্ষিণ ২৪-পরগণা

মুদ্রক :
সনাতন সাঁতরা
দি সারদা প্রিন্টার্স
১৫, কানাই ধর লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৩
এপ্রিল, ১৯৫৬

ক্ষুধা

॥ এক ॥

অনেকদিন বাদে কৌয়ারের আবার শিকার করার প্রাচীন ইচ্ছা জাগ্রত হল। অনেককাল শিকার করেননি, সে জন্যেই বোধহয় স্বপ্নে দেখলেন, কুনারী ভূঁইনকে। একেবারে বিশ বছর আগেকার সব ঘটনা স্বপ্নে ফিরে এল। কিছুদিন ধরেই রক্ত চনমন করছে, দেহ উদাস লাগছে, সেই জন্যেই কি স্বপ্নটা দেখলেন?

ঠিক বিশ বছর আগের কৌয়ার, স্বপ্নে তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশই ছিল। নিয়মিত ব্যায়াম, ঘোড়া চড়া, শিকার ও মালিশমর্দনে শরীর সতেজ, বলিষ্ঠ, পেশল, দেহের রক্ত-মাংস খুব ক্ষুধার্ত। স্বপ্নে দেখলেন, বিকেল ও সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে তিনি শিকারে বেরিয়েছেন। শিকারটিকে আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। মহুয়া কুড়াবার ঋতু এটা। জঙ্গলে গেলে জানোয়ার মেলে। ভালুক আসে, হরিণ আসে। কিন্তু জানোয়ার শিকারে আর কত মজা মিলতে পারে? কৌয়ারের বাবা, প্রাক্তন কৌয়ার, শিকার বলতে জানোয়ারই বুঝতেন। যে জন্য মৌয়ার ভবনের হলঘরে এখনো কিছু বাঘের চামড়া, বাঘ ও ভালুকের মাউণ্ট করা মাথা ও চামড়া, প্রতিটি সোফার পায়ের কাছে চিতাবাঘের চামড়া দেখা যায়।

স্বর্গবাসী পিতা এক পত্নীব্রত ছিলেন। এটি পরিণামে কৌয়ারের পক্ষে সৌভাগ্যজনক হয়। কেন না তিনি একতম পুত্র, পাঁচ বোনের এক ভাই। লারাতুর কৌয়ার পদে তাঁর ভাগীদার কেউ হয় নি। বাবা একাধিক পত্নীর গর্ভে একাধিক পুত্র উৎপাদন করলে আঠারো হাজার বিঘার জমিদারী লারাতু ভাগ হয়ে যেত। মামলা-মোকদ্দমা লেগে থাকত। বিশ বছর আগেও হাজার বিঘা ছিল জঙ্গল।

স্বপ্ন দেখলেন, জঙ্গলের পথে তিনি তাড়া করে চলেছেন কুনারী ভূঁইনকে। আগের দিনই দেখেছিলেন স্বামী-স্ত্রী মহুয়া কুড়াচ্ছে।

কুনারীর পিঠে বাঁধা একটা বাচ্চা। মহুয়া কুড়াচ্ছে, খাচ্ছে, হাসছে। কুনারীর চুল রুক্ষ, শরীর তেলতেলে, আর যৌবন, যৌবন! তাঁদের ঘরে একটা মেয়ে বা বৌয়ের অমন যৌবন হয় না। স্বামীটার চেহারাও দেখার মত।

আগের দিনই ওদের দেখেছিলেন। ওরা খেড়া গ্রামের নাগোসিয়াদের সঙ্গে এসেছিল। সকলে এক জায়গাতেই বসেছিল। কুনারীর দিকে চোখ রেখে কৌয়ার বলেছিলেন, মৌয়া কুড়াচ্ছিস?

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই।

—হাঁ মালিক পরোয়ার!

—পোরমিট নিয়েছিস?

—নিয়েছি মালিক!

—এদের সঙ্গে এসেছিস?

—এরা এল, তাই চলে এলাম।

—আচ্ছা, বেশ, বেশ!

সারা বছর জঙ্গল তাঁর একার। মহুয়ার ঋতুতে সবাই মহুয়া কুড়াতে পারে। বিক্রমশাহী নিয়ম। কৌয়ার কেন, পালামৌ জেলাতে রাজা জমিদার মানেই রাজপুত। আর পালামৌয়ের রাজপুতরা আজও বিক্রমশাহী নিয়ম ও বিক্রম সংবৎ মানেন।

—তা এখানেই কুড়াবি? শিকারখানার ওখানে তো মহুয়ার গাছ এত বড় বড়।

—ডর লাগে মালিক!

—কিসের ভয়? বাঘের? বাঘ তো গারদে কয়েদ থাকে, তাই না?

কৌয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান।

শিকারখানা তাঁর বড়ই প্রিয়। সেখানে একটি জানোয়ারও পোষা নয়। ছোট ঝিল, জঙ্গল, সব ঘিরে বিশাল উঁচু মোটা মোটা লোহার শিক ও জালের ঘের। শিকের মাথাটা ভেতর দিকে বাঁকানো, মাথাটা ছুঁচলো। লাফিয়ে পালাতে গেলে জানোয়ার বিদ্ধ হয়ে মারা যাবে।

বন্য আক্রোশে বুনো লেপার্ড ঘোরে, ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখতে তাঁর ভাল লাগে। মাংস নয়, জালে ধরে তাজা হরিণ, নয় জ্যান্ত ছাগল খেতে দেন কৌয়ার। গভীর জঙ্গলে শিকারখানা থাকার অন্য সুবিধাও আছে।

স্বপ্নে দেখলেন, কুনারী ভুইন গাছের ফাঁক দিয়ে এঁকে-বেঁকে পালাচ্ছে। তিনি কাছে, আরো কাছে। অবশেষে কুনারী হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। কৌয়ার নামলেন।

নিজের হাত দেখলেন।

হ্যাঁ, কুনারীর পিঠের পোঁটলাটা টেনে ফেলে দিয়েছিলেন, খুলে নিয়েছিলেন ওর কাপড়। তারপর কুনারী ওঁর হাত কামড়ে ধরে।

হাতের যন্ত্রণাতেই কৌয়ারের ঘুমটা ভেঙে গেল। আশ্চর্য, স্বপ্নটা এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওঁকে, যে সচকিতে বাঁ হাতটা দেখলেন।

আছে, ক্ষীণ দাগ আছে। তাঁর ডাক্তার ভাগ্নে অনেকবার বলেছে, ওটুকু প্লাস্টিক সার্জারি করে দেয়া যায়।

কৌয়ার বলেছেন, না না, থাক! ওটা শিকারের চিহ্ন! মাদী জানোয়ার ছিল, সঙ্গে বাচ্চা! সে ছেড়ে দেবে? মরতে মরতেও নখের চিহ্ন রেখে গেল একটু।

ভাগ্নের কথা তাঁর পছন্দ হয় নি। বলেছিলেন, দিল্লীতে ছিলে, চলে যাচ্ছ বিদেশে। রাজপুত আমি, রক্তের গৌরবই ভুলে গেলে। বিয়ে করলে সেও স্বজাতে নয়। তোমার বাবা…

ভাগ্নে বলেছিল, দেশে থাকলে বাবার মত, মামার মত হয়ে যাব, ওহি তো ডর আমার!

—কিছু খারাপ তোমার বাবা, মামা?

—না না, আপনারা তো নমস্য, আমিই আপনাদের যোগ্য হতে পারি নি। মাদী জানোয়ার মারতেন?

—মাদী জানোয়ার মারতেই তো মজা!

হ্যাঁ, মজা হয়েছিল। কুনারী তার পরেও ওঁকে আঁচড়ে কামড়ে দিতে চেষ্টা করে, সে জন্যেই তো ওর গলায় পা দিতে হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় শিকারখানায় বড় মাংস দেওয়া গিয়েছিল। কুনারী আর তার বাচ্চা।

তারপর যা যা হয়, সে তো কৌয়ার কখনো ভুলবেন না। ভাবলেও এখনো মাথায় আগুন জ্বলে যায়।

স্বপ্নটা মাঝে মাঝে দেখেন কৌয়ার, আর স্বপ্নের রেশ মনে লেগে থাকে, অনেকক্ষণ লেগে থাকে।

সকালে এসব কথা কৌয়ার কিছুক্ষণ মাত্র ভাবলেন। না, তাঁর ছেলে মানুষ হয় নি। জমি বাপের নয়, দাপের। এই দাপ বা তেজটা জমিদারী তেজ হওয়া উচিত ছিল। তা হল কোথায়? ভাবলে পরে বুকের ভেতর আগুন জ্বলে। তাঁর ছেলে বোঝে ব্যবসা। "ব্যবসা" শব্দটিতে কৌয়ারের ঘেন্না, কিন্তু সময়ের হাওয়া তিনি আটকাবেন কেমন করে?

বাইরের ঘরে এলেন।

না, বাইরের হলঘরের চেহারা খুব জঘন্য হয়ে গেছে। কাচের কেসে সুরক্ষিত খড়ের স্টাফিংয়ে বাঘ, ভালুক, বারশিঙা হরিণের মাথা, চিতারা, বাজ, সবই ও বেচে দিয়েছে।

কার কাছে? না, ওর পাটনা নিবাসী বন্ধুর কাছে। মাকে বলেছে, ওসব জমিয়ে লাভ? বিদেশে এসব জিনিসের দাম জানো? আমাদের বাড়ির বাসনবর্তন, আসবাব, সব আমি বেচে দেব। বিদেশে কেন, দেশেও পুরনো জিনিস মোটা টাকায় বিক্রি হয়। এরকম হাতির মতো বাড়ি রেখে লাভ? মডার্ন বাড়ি করে নেব। সিনেমায় যেমন দেখ।

কৌয়ারের স্ত্রীও রামগড়ের রাজবংশের মেয়ে। তাঁর ভাইরা আর্মিতে অফিসার। রাঁচিতে কারখানা-মালিক, স্বামীর বিক্রম সংবতে পড়ে থাকাটা তাঁর পছন্দ নয়।

বড় ছেলেটা হয়েছিল তাঁর মত। কিন্তু সে তো দশ বছর বয়সে

মরে গেল। এ ছেলে হয়েছে তার মায়ের মত। দিনকালও পালটে গেল। নইলে কৌয়ার কি ভেবেছিলেন, তাঁর মেয়েরা ডালটনগঞ্জে স্কুল-কলেজে পড়বে? কুনারীর ঘটনা থেকে অনেক কিছুই ঘটে যায়, যার ফলে কৌয়ার কিছুটা চুপ করে যেতে বাধ্য হন কিছুকাল।

॥ দুই ॥

আসলে কুনারীর ব্যাপারে কোন হইচই হবে তা তিনি ভাবেন নি। কুনারী প্রথম মেয়ে নয় যাকে কৌয়ার তুলে নিয়ে গেছেন। আর তাঁর ক্রোধের শিকার হয়ে আরো মানুষ শিকারখানায় হারিয়ে গেছে, কে কবে একটা কথা বলেছে?

কুনারীর স্বামী বিশাল ভূইঞার কথা কৌয়ার ভাবেনই নি। খেড়া গ্রাম থেকে মৌয়া কুড়াতে আসে এমন একটা ছেলে সম্পর্কে কৌয়ার ভাববেন কেন? এ কথাও সত্যি, যে কুনারী নিখোঁজ হবার পরদিন থেকে বন খুব জনশূন্য হয়ে যায়। মহুয়া কুড়াচ্ছিল যারা, তারা উধাও, এখানে ওখানে টুকরি পড়ে থাকে, মহুয়া ছিটানো।

এ বরদাস্ত করা যায় না। মহুয়া বনজ ফল। প্রচলিত নিয়ম, মহুয়া যে কুড়াবে তার হবে। কিন্তু কৌয়াররা চিরকাল কাছারি থেকে পারমিট দিয়েছেন। যারা তোলে, তারা কৌয়ারদের দাস বনে গেছে। মহুয়া কাছারিতে জমা দাও, নিজেরাও একেক টুকরি নাও।

—এবার হঠাৎ সবাই উধাও? বড়া তাজ্জব!

কৌয়ার তশীলদারকে ডাকে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি নিজ আত্মীয় ও বিরাদরির মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তশীলদার কাজে তশীলদার ও নামেও তশীলদার সিং। কৌয়ারের কাছারি এবং অন্যান্য কাজে তশীলদার খুব বিশ্বাসযোগ্য। বাবার কালে তশীলদারের বাবা তশীলদার ছিল, পিতামহের কালে তশীলদারের পিতামহ। তিন পুরুষের নিমকের বন্ধন এই বিশ্বাসের বন্ধন হয়ে উঠেছে। কৌয়ার বলে, কা হুয়া তশীলদার? জানোয়ার মৌয়া খাচ্ছে, মানুষ সব ভেগে গেল? তশীলদার চুপ।

—চুপ করে আছ কেন ?

— বলুন, কি করব ।

খেড়া ও সংলগ্ন গ্রামগুলি কৌয়ারের ক্রীতদাসদের গ্রাম। মৌয়ার আঠারো বিঘা জমি রাখে যখন, সে জমি চাষ করাবার জন্যে হাজারখানেক দাস দরকার। সুখের বিষয় পালামৌ জেলাতে "বণ্ডেড লেবার" প্রথা দীর্ঘকাল বিদ্যমান। ১৯৭৬ সালে সরকার তা কাগজে উচ্ছেদ করার পর এ প্রথা আরোই জেঁকে বসেছে। জমিমালিকরা সামান্য টাকা ধার দেয়। একেকজন বিপন্ন গ্রামবাসীকে। লোকটি বিপদে পড়েই ধার নেয়। তারপর মালিকের ঘরে ও জমিতে উদয়াস্ত খেটে চলে সে। তার মনে আশা থাকে যে একদিন, সে যে এত বছর খাটল শুধু কিছু জলপানি, আর সামান্য ধান বা ভুট্টার বিনিময়ে, তাতে তার ঋণ শোধ হয়ে গেছে।

কিন্তু সে জানে না লেখাপড়া। মালিকের খাতায় কি লেখা আছে তা সে বোঝে না। মালিকের তশীলদার খাতা খুলে দেখিয়ে দেয়, যে বিশ বছর আগে তুমি যে বিশ টাকা নিয়েছিলে, চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বাড়তে বাড়তে তা আজ আড়াই হাজার টাকা হয়েছে।

—সে কত টাকা হজৌর? বিশের হিসাবে বলুন। এক বিশ, দো বিশ ?

—একশো পাঁচিশ বিশ ! সমঝলি ?

—কৈসে মহারাজ ? তাহলে আমার ছুটি হবে না ?

—ছুটি ?

হা হা করে হাসত তশীলদার। কাছারির সবাই হাসত হা হা করে। সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে মালিকের কাছে একবার ধার নেবার পর কোন গরিব ভূঁইয়া—দুসাদ চামার—রবিদাস—গঞ্জু—ওরাওঁ—নাগেসিয়া—খারোয়াড় কখনো মুক্ত হতে পারে ?

হাসি থামিয়ে সদয় করুণায় তশীলদার বলত, না না, হাসি উঠানো ঠিক নয়। ছোট জাত, গরিব, সে তো হিসাব জানবেই না।

লোকটিকে বলত, তোর জনম কেটে যাবে. শোধ হবে না। তোর

ছেলের সময়ে দেখ্ ও টাকা বেড়ে কোথায় যায়। জনম জনম কেটে যাবে রে!

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে চলে যেত।

পালামৌয়ে, এই সামান্য ঋণের দায়ে বণ্ডেড লেবার যে কতজন সে হিসাবও সঠিক মেলে না। এই দাসমজুরদের নানা নাম পালামৌয়ে, সেওকিয়া, কামিয়া, হরোয়াহা, চরোয়াহা।

কৌয়াররা পুরুষানুক্রমে এদের দাস করে রেখেছে। তবে মহুয়া কুড়াবার ঋতুতে এরাও আসে, মহুয়া নেয়। বছরে সাতদিন ওরা মৌয়া কুড়ায়।

কৌয়ার তশীলদারকে বলল, খেড়া গ্রামের লোকেরাই চলে গেল?

তশীলদার চুপ।

—খবর দাও, খবর দাও। মৌয়া তুলে দিয়ে যাক। তশীলদার নিঃশাস বলল, ও হি বিশাল ভূঁইঞা!

—কে, কে বিশাল ভূঁইঞা।

—বউ-বাচ্চা নিয়ে মৌয়া টুকাতে এসেছিল।

—খেড়া থেকে?

—খেড়া থেকে।

—তাতে কি হল?

—বিশাল তো গ্রামে থাকে না। ডালটনগঞ্জে রামাশ্রয় প্রসাদের বাগানে কাজ করে। সে গ্রামে ক'দিনের জন্যে এসেছিল। বিশালের মামা হয়, শিকারখানার বরজু।

—তাতে কি?

—কি বলব হজৌর। বউ-বাচ্চা নিয়ে মৌয়া কুড়াতে এল। বউ-বাচ্চা নিখোঁজ হয়ে গেল। তাতেই বিশাল তাকে খুঁজতে গেছে। আর, আর—বরজুও চলে গেছে।

—চলে গেছে?

কৌয়ারের শিকারখানায় বাঘদের খাবার জোগায় বরজু। সেদিনও

বরজু নিজের ঘরে ছিল, যেদিন কৌয়ার শিকার খেলছিলেন কুনারীর সঙ্গে।

—বরজু চলে গেছে ?

—হাঁ হুজৌর।

কৌয়ার বলেছিলেন, আমার বাঘ ভুখা থাকবে না। লোক পাঠাও, ধরে আনো বরজুকে আর বিশালকে।

বিশ বছর আগকার কথা, কিন্তু কৌয়ারের সব মনে আছে। তার নিজ-জাতের বাছাই বাছাই ছেলেরা তাঁর সিপাহী। নিজস্ব সেনাবাহিনী না রাখলে কেমন করে তিনি রক্ষা করতেন তাঁর জমি-জঙ্গল ? মৌয়া-বিড়িপাতা-লাক্ষার কারবার ? দাপে রাখতেন তাঁর দাসমজুরদের ?

বরজু বা বিশালকে গ্রামে পাওয়া যায় নি। গ্রামটি নাগেসিয়াদের নাতি উচ্চ টিলার ওপর। নাগেসিয়াদের জীবনে কোন প্রাচীন যুগে বহিরাগতরা ওদের আক্রমণ করেছিল। তখন নাগেসিয়ারা পাহাড়ে উঠে যেয়ে ঘর বাঁধে। যাতে শত্রু কোনদিক থেকে আসবে তা দেখা যায়। এখনো ওরা ঘর বাঁধতে টিলা বা ডুংরি খোঁজে।

ভুঁইয়াদের একটিই ঘর নিচে। ঘরটি বরজুর। সে কদাচ গ্রামে আসে। নাগেসিয়ারা বলল, বিশাল ওর বউকে নিয়ে এসেছিল, ক'দিন ছিল। কেন না ওর ঘরের পাশ দিয়েই নাগেসিয়ারা নিজেদের গ্রামে উঠে যায়। কুনারীকে ওরা বড়াটোলির পঞ্চায়েতী কুয়াতে জল নিতেও দেখেছে।

—বরজুকে দেখেছিস ?

—না তো। সে তো আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না, আর মাথা গামছায় ঢেকে বাঘের ডাক ডাকে, আমরা খুব ডরে যাই।

—বিশালরা গেল কোথায় ?

—জানি না মালিক।

—তোরা মৌয়া কুড়াতে কুড়াতে চলে এলি ?

—গনো নাগোসিয়ার মেয়েটার ব্যথা উঠল, বাচ্চা হয়ে গেল। তাতে পাহান বলল, গাছ পূজা করে মৌয়া কুড়াই, তাতে পুরো গ্রামের

জন্মাশৌচ লেগে গেল, আর থাকা চলবে না। তাতেই চলে এলাম মালিক। এবার মৌয়া কুড়ানো বরবাদ হয়ে গেল।

কৌয়ারের লোকরা এ-ওকে বলল, এরা মানুষ নয়, জানবর। এক ঘরে জন্মালে সবার অশৌচ, এক ঘরে মরলে সবার অশৌচ।

—আরে ভৈয়া, কাজের কথা শুধাও ওদের।

—শুধাচ্ছি। এই, তুই বল্।

—কি বলব হজৌর?

—বিশালরা গেল কোথায়?

—কেন, ঘরে নেই?

—তোরা যাচ্ছিস কোথায়?

—ক্ষেতে কাজ করতে হুজুর।

—মৌয়া কুড়িয়ে কাছারিতে তুলে দিতে হবে।

—আমরা অশৌচে আছি, গাছের ক্ষতি হয়ে যাবে মালিক! গাছ আমরা পূজা করি। অশৌচে আছি। গাছের নিচে যেতে পারি?

অশ্বারোহী মালিকরা এ-ওর দিকে তাকায়। জনম জনম যারা কৌয়ারদের দাস, তারা মিছে বলবে না। ওরা চলে যায়।

গনো নাগেসিয়া আস্তে বলে, বরজু! ঘর থেকে বেরোস না। আর সাম লাগলে চলে যাবি টাউনে। এখানে তোদের বাঁচাবার আর কোন উপায় আমাদের নেই। ঘর থেকে বেরোস না একবারও। পিসাব লাগলেও না।

নাগেসিয়ার ঘর দিনে রাতে অন্ধকার। অন্ধকার থেকে বরজু বলে, তোরাও চল্। রাতে পালিয়ে চল্। বিশাল তো শোর উঠাবে, তখন তোরা বাঁচবি?

—টাউনে কে আমাদের সাহারা দেবে?

—কে কবে কোন ভূঁইয়া, কোন্ নাগেসিয়ার সাহারা করেছে, যে আজকে সাহারা দেবে? টাউনে লাইনের পাশে বরবাদ রেল-গুদামে থেকে যাবি। রামাশ্রয়জী তোদের তুলে দেবে রেলে। চলে যাবি গোমো।

—সেখানে কি খাব?

—এখানে কি খাস?

গনো নিচে সবুজ রবিশস্যের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকে। এসব জমি নাগেসিয়াদের ছিল, কৌয়ার বংশ দখল করে নিয়েছে। ওই জমিতেই ওরা শ্রম দেয়।

বরজু বলে, গোমোতে রেলে বহোত কাজ হচ্ছে। রামাশ্রয়জী তোদের চিঠি দিয়ে দেবে। লেবার-ঠিকাদার তোদের কাজে নিয়ে নেবে। এখানে থাকলে কৌয়ার খেড়াকে ঝুঝার বানিয়ে দেবে।

কৌয়ারের পিতামহ, তৎকালীন কৌয়ার, ঝুঝার থেকে মাহাতো, নাগেসিয়া, গঞ্জুদের ঘর জ্বালিয়ে খুন করে, লাশ সরিয়ে ফেলে ঝুঝারের দখল নিয়েছিল। ঝুঝার বা খেড়া এখন লারাতুর এক্সটেনডেড মৌজা, জমি রেকর্ডেও তাই।

পালামৌ ইতিহাসে কৌয়াররা, মালিকরা এই ভাবেই জমি বাড়িয়েছে, ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ওদের বেলা সরকারী আইন খাটে না। পালামৌকে ওরা সামন্তযুগেই রেখে দিয়েছে।

বরজু বলে, আমরাও তো যাব তোদের কাছেই। ওখানে একটা নয়া খেড়া বানিয়ে নেব।

গনো নিশ্বাস ফেলে। বলে, তুই মালিকের শিকারখানার জন্যে অনেক হরিণ ধরলি, আমাদেরও খাইয়েছিস। যা বলছিস শুনব। তবে সকলে কথা বলে নেব।

—এখন কাজে যা!

বরজু আর বিশাল নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বরজু বলে, জল রেখে গেছে, বস্তায় মৌয়া আছে। রাত হলে বাঁচি।

—তুমি দেখলে, কুনারাকে আর ছেলেকে খাঁচায় গড়িয়ে দিল?

—আমার ঘর থেকে দেখলাম। এ কাজ তো মালিক সর্বদা নিজে করে।

—কুনারী···মরে গিয়েছিল?

—হাঁ বিশাল!

—ছেলেটা ?

—দুজনেই মরে গিয়েছিল।

—আমাকে যদি সেদিন বলতে ?

—কেমন করে বলতাম ? তুই তো জঙ্গলে দৌড়ে দৌড়ে ওকে ডাকছিলি। আমি না তোকে ধরলাম।

—হ্যাঁ···পারো নাগেসিয়া গাছে উঠে গিয়েছিল। মালিক ওদের নিয়ে চলে যেতে পারোই তো এসে বলল, ভাগো সবাই, ভেগে যাও। কৌয়ার কুনারী আর বাচ্চাটাকে খুন করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেল। তখন সবাই ভাগল, আর আমি যত ঘুরছি জঙ্গলে, তত দেখছি জঙ্গল থেকে বেরোতে পারছি না।

—বরজু আস্তে বলে, জঙ্গলও তো তোকে ঘুরাচ্ছিল।

—কেন ?

—আমার কাছে এনে দেবে বলে।

—তখন তুমি যদি বলতে !

—তখন কি জানি, কার লাশ ফেলল ? তুই বললি, তাতে তো জানলাম।

—আমি জানলে ··কৌয়ারকে ··

বরজু কঠিন গলায় বলে, কৌয়ার এ কাজ আজ করে নি, আগেও করেছে। কিন্তু এখন দেখতে হবে আর না করে ! আর সে কাজ খুব কঠিন। সেদিন তুমি কৌয়ারকে কি করতে ? ও আমাদের বন্দুক তুলে মেরে দিত বই তো নয়।

—কুনারীর পরনে কাপড় ছিল না।

—চুপ কর্ বিশাল, চুপ কর্। মরে গেল যে, তার আর লাজলজ্জা কি থাকবে ?

ওরা অন্ধকারে মিশে বসে থাকে।

—নাগেসিয়ারাও বিপদে পড়ে গেল।

—চুপ কর্।

বিশাল মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে থাকে।

আশ্চর্য এই, যে কৌয়ার কিছু বোঝেন নি। এতটুকু আঁচ করতে পারেন নি, কি ঘটতে চলেছে। কি কুগ্রহ হয়ে এসেছিল মেয়েটা, কি কুগ্রহ! পরে বউ বলেছিল, অজাত কুজাতের মেয়ের জন্যে লালচ ভুলে যান।

—কেমন করে?

—এত অপযশ তো সে থেকেই হল।

—যখন খিদে পায়, পেট কি চায়?

—হা ভগবান! খিদে আমার পায় কোথায়? খিদেই তো পায় না। টাইমে টাইমে জোর করে খাই।

—আরে বোল না, ভুখা পেট কা মাংতা?

—খানা।

—আমার রক্তের খিদে পায়, রক্ত অছুতজংলী আওরত চায়।

—স্বজাতে বিয়ে করে নিন? নয়··

—নয় কি করব? বেজাতের মেয়ের ইজ্জত লুটতে পারি, তা বলে স্বজাতের মেয়ের? ছি ছি!

—আর ওরাও কি হারামী, অ্যাঁ? এত পুরুষের সম্পর্ক, কিছু মনে রাখল না?

—জানবর, জানবর সব! কিন্তু বরজুকে পেলে···

বরজুকে পান নি। বড়াটোলি মাহাতো গ্রাম। ওরা স্বাধীনতার পরে এসেছে। সরকারকে খাজনা দিয়ে জমি চাষ করে। কৌয়ারের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। বড়াটোলির মাহাতোদের, নিজেদের ছাগলগুলি দিয়ে যায় নাগেসিয়ারা, তার বদলে যৎসামান্য টাকা, বস্তা বোঝাই ছাতু ও ভুরাগুড় নিয়ে যায়। বলে যায়, হঠাৎ একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অশৌচ কেটেছে। ছাতু দিয়েই গ্রাম ভোজন হবে।

সকালে বেলা গড়িয়ে যায়, ওরা কাছে আসে না। ঝুঝার, নাঢ়া, কোকার, গাইবানী, চৈতপুরা, মাকাপুরা, কৌয়ারের মৌজায় মৌজায় যত গ্রাম আছে, প্রতি জায়গার লোক বলে, কিছুই জানে না।

বড়াটোলির মাখন মাহাতো সাইকেল চেপে মাস্টারি করতে

যায়। সে বলে. লেবার-কণ্টাক্টার ঘুরছে। কোথায় নিয়ে গেছে, ঠিক কি ?

—লেবার-কণ্টাক্টারের এত সাহস যে আমার কামিয়া ভাঙিয়ে নেয়?

মাখন মাহাতো, যে ইংরেজি জানে বলে কৌয়ারের কিছু কাজ করে দেয়. সে সবিনয়ে বলে, লেবার, ঠিকাদার তো লেবার খোঁজেই।

—এ কাজ সরকার করতে দেয় কেন ?

—স্বাধীন দেশে ঠিকাদার ছাড়া কোন কাজটা চলে বলুন ?

—কিসের স্বাধীনতা! আমি তো বুঝতেই পারি না। রাজপুত ঠাকোররা চিরকাল স্বাধীন ছিল, যা চেয়েছে তা করেছে, এখনো করছে। আজাদী তো কামিয়ার জন্যে নয়! তার মালিক কি তাকে আজাদী দিয়েছে ?

মাখন মাহাতোর মুখে এসে যায়। কামিয়াও স্বাধীন। কিন্তু সে বলে না। কামিয়ৌতি প্রথা থাকলে কামিয়া সত্যিই স্বাধীন নয়।

কৌয়ার বলেন, সব বেটাকে আমি জুতোর নিচে এনে ফেলব আর ধান যেমন মাড়াই করে, তেমন মাড়াব। নইলে আমার শান্তি হবে না।

—কী!

—আপনি তো টাউনে যান। একটু চোখ-কান খোলা রাখবেন তো!

--দেখুন না কি হয়! ওরা তো দেও-দেওতা, ভূত-পিশাচ খুব মানে। কোন কারণে চলে গেছে হয়তো, ফিরে আসবে আবার।

—কোথায় যেতে পারে? অতগুলো লোক চলে গেল, ছাগল সুদ্ধ নিয়ে গেল! তশীলদার! কাল থানাতে একটা খবর দেবে ?

না, থাক। আমার কামিয়া, আমি দেখব!

মাখন মাহাতো বলে, আমি তো টাউনে যাব, ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনব বাবার জন্যে, খোঁজ নেব।

—এহি তো আপনাদের দোষ। কুর্মি গ্রামে অফসর-টফসর হচ্ছে, লেখাপড়া ঢুকছে, আর আপনারা বৈদ্-হাকিম সব ভুলে বসে আছেন।

ডাক্তার! কি হবে ডাক্তার? সরকারের টাকাও হাতে চুলকায়, তাতে এসব জঙ্গল এলাকায় হাসপাতাল করতে চায়। শুনেছেন, রামকাণ্ডাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করে দেবে?

—শুনেছি।

—পূজাতাজা দিলে দেবদেবতাকে খুশি রাখলে ওষুধ-ডাক্তার লাগে না। আমি তো বাড়িতে ডাক্তার ঢুকাতাম না, এখনো ঢুকাই না। কিন্তু অন্দরমহলে ডাক্তারে বিশ্বাস খুব! পাটনাওয়ালী তো! টাউনের হাওয়াই অন্য রকম।

—তবে আসি কোয়ার সাব।

—আসুন!

মাখন মাহাতো প্রাণপণে সাইকেল চালায় এবং লারাতু-ফাঁড়ি পেরিয়ে মাইল দুই এসে এক সর্দারজীকে ট্রাকে চেপে বসে স-সাইকেল।

ডালটনগঞ্জে পৌঁছে ও দৌড়য় শিবাজীময়দান। রামাশ্রয় প্রসাদের বাড়িটা সেকেলে বাড়ি। সামনে জমি, পেছনে জমি, ছড়ানো বাড়ি। বাড়ির একান্তে রামাশ্রয়ের প্রেস। সেখানে জব কাজ চলে। মাঝে মাঝে রামাশ্রয় চটি চটি বই ছাপে ও দিকে দিকে পাঠায়। কামিয়া-সেওকিয়া প্রথা সরকার তুলে দিক, এ কথা সে কথা সে প্রায়ই বলে থাকে। বিশাল যে এখানে আসতে পারে সেটা মাখনের মনে হয়েছে বলেই এ আকুলতা। রামাশ্রয় ও মাখন সহপাঠী ছিল, রামাশ্রয়ের চিন্তাধারা যে অবাস্তব, স্বপ্নই থেকে যাবে তাতে মাখনের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিজে বড়াটোলিতে কতিপয় ছাগল ও মোষের মালিক হয়ে জীবন কাটাতে চায় না। সরকারী কাজে ঢোকার তত্ত্বাবধান করতে সে টাউনে আসে ও রামাশ্রয়ের বাড়িতে ওঠে। পাটনা গিয়ে পরীক্ষা দেয় ও ফেরার পথে এখানে রাত কাটায়। রামাশ্রয় টাউনে থাকে, বি. এ. পাশ, সে কেন চাকরিবাকরি জুটিয়ে অবস্থা ফেরায় না, কেন প্রেসে মাঝে মাঝে "পুলিশী জুলুম নেহি চলেগা" জাতীয় ইস্তাহার বা পুস্তিকা ছেপে সকলের বিরাগভাজন হয়, তা মাখন জানে না। কিন্তু তার বাবার অসুখে রামাশ্রয়ের স্কুল-

শিক্ষিকা বউ বাড়িতে রেখে বাবার ঝামেলা সয়েছিল তা মাখন ভুলতে পারে না।

অতএব সে রামাশ্রয়কে সাবধান করতে আসে। রামাশ্রয়কে বলে, ওরা এলে ঢুকতেও দিও না, মারা পড়বে।

—কেমন করে?

কোয়ারের হাত খুব লম্বা।

—দেখেছি। ওর টাউনের বাড়ি এখানেই। পথঘাটে দেখাও হয়েছে।

—সাবধানে থেকো।

—নিশ্চয়, কিছু চিন্তা কোর না।

—আমি রাতটা থাকব।

রামাশ্রয় বলে, থাকবে?

—কোন অসুবিধে আছে?

—আমার নয়, তোমার অসুবিধা হবে। কেননা···

রামাশ্রয়ের বউ ঘরে ঢোকে। তার চোখমুখ খুব লালচে, চোখ চঞ্চল।

—বলো, মাহাতোজীকে বলো! এত বড় বিপদ একা মাথায় নিচ্ছ, আমাদের বিপদে ফেলছ, বলো ওঁকে।

—আস্তে সীতা, আস্তে।

—আস্তেই বলছি।

রামাশ্রয় বলে, আমি তো বলছি, মাখন চলে যাক।

—না, আমি বলে যাই।

মাখন মাহাতো সবই বলে। রামাশ্রয় বলে, আমি তো আর কিছু পারব না। বিশাল, বরজু, আর নাগেসিয়াদের অন্তত সরিয়ে দিই। সব আমি লিখে নিয়েছি। ওরা টিপছাপও দিয়েছে।

—কি করবে? ছাপবে?

—পাগল? তবে এটা তো আমি চাই, যে পালামৌ জেলার নামটা ম্যাপে উঠুক।

—কি বলছ যা তা! বিহারের ম্যাপে পালামৌ নেই ভারতের ম্যাপে বিহার নেই?

—কেমন করে বোঝাব। আরে পালামৌয়ে কি চলে, কেমন অত্যাচার, বাইরে কে জানে?

—লিখলে তুমি বিপদে পড়বে ভাই।

—আমি লিখব না। রাজা, জমিদার, পুলিশ সাহেব, মন্ত্রী, সবাই, কৌয়ারের মত। আমি লিখব কোন্ সাহসে? সঙ্গে পাঁচজন শক্তি জোগালে লিখতাম।

—তবে কি করবে?

—জানি না, এখনো জানি না। আগে তো ওদের সরিয়ে দিই। এখানে থাকলে ওদের জান বাঁচানো যাবে না।

মাখনের গলা নেমে আসে, কোথায়?

—ব্যবস্থা এক রকম করেছি।

গীতা বলে, হ্যাঁ, ওঁকেও জড়াও!

রামাশ্রয় ঈষৎ হেসে বলে, মাখনরা তো ওদের ছাগল-টাগল কিনেছে। জড়াতে আর বাকি আছে কি? মাখনের দরকারে আমি থেকেছি। আমার দরকারেও একবারই থাকুক। সিধা চলে যাক রাঁচি।

—কে? আমি?

—ওরা, ওরা। রাঁচি? ধানবাদ? দেখি কার ট্রাক পাই।

—বিশাল? বরজু?

—সব।

॥ তিন ॥

শেষ অবধি নাগেসিয়ারা রাঁচি নয়, ট্রাকে চেপে টাটা চলে যায়। বিশ বছর আগে টাউন থেকে হরদম লেবার চলে যেত বাইরে। টাটাতে নেমে প্রথমে ওরা হকচকিয়ে যায়। বরজু বলে, কৌয়ারের কাছে বহাল হবার আগে, বাবা যখন কামিয়া, তখন এখানে কাজ করে

গেছি। চক্রধরপুরেও গেছি। দেশে গেলাম টাকা কামিয়ে, তারপরই ফেঁসে গেলাম। চল্, দেখা যাক, কি মেলে।

টাটাও মস্ত বড় হয়ে গেছে, তবু ট্রাক ড্রাইভারের সাহায্যে ওদের নিয়ে সোহনলালের ইট ভাটাতে চলে যায় বরজু। বলে, দেখে নে, কত কত জায়গা থেকে কত লোক এসেছে। পড়ে থাক গাছের নিচে। গ্রামাশ্রয় কী টাকা দিয়েছে কিছু, যা হয় কিনে খাবি।

—তুই যাস না বরজু।

—ভরসা রাখ গনো। আমাকে তো এখনো দৌড়াতে হবে, না?

—এত লোক এখানে!

ড্রাইভার বলে, সকালে ঠিকাদার আসবে, কাজে নিয়ে যাবে। সে জন্যেই তো এখানে আনলাম।

গনো অগণিত কালো কালো আনাড়ি লোকের মুখ দেখে যেন কোনো ভরসা পায়। নিশ্বাস ফেলে বলে, যা হবার হবে! তোরা চলে যা।

—এক সঙ্গে থাকিস। মেয়েছেলেদের সামলে রাখিস।

ড্রাইভারটি বলে, তুমি যাও না, আমি দেখে রাখব।

গনো খুব ভরসা পায় না। নিচু গলায় বলল, তেমন ভরসা পাচ্ছি না বরজু।

—কাহে কো?

এ সময়ে ধুতি ও শার্ট পরা একটি বেঁটে ও বলিষ্ঠ লোক এগিয়ে আসে। বলে, কি হয়েছে? এরা কারা?

বরজু নমস্কার করে। বলে, আপনি?

—আমি ভারত জোঙ্কো। তোমরা?

—এরা কাজের খোঁজে এসেছে···পলামু থেকে।

—কেন?

—সেখানে রোটি নেই।

ভারত জোঙ্কো বলে, কতজন?

—এই তো! বাচ্চা বুড়া নিয়ে তিরিশ জন হবে।

—এখানে নয়, এদিকে এসো। এদিকে আমাদের লোকজন আছে।

—গাঁওলি দেহাতী।

—হাঁ দাদা, এরা নাগেসিয়া।

—আদিবাসী ?

—আর কি !

লোকটি নিশ্বাস ফেলে। বলে, কাজ আছে, পয়সা আছে, কিন্তু বহোত লড়াই করে বাঁচতে হয়।

—আমাকে পাটনা যেতে হবে, নইলে আমি থাকতাম।

—পাটনা !

—সে ··বহোত বড় লড়াই দাদা।

—এদের রেখে যেতে ভয় পাচ্ছ ?

—জানে না কিছু।

ভারত নিশ্বাস ফেলে। বলে, আমাদের ওখানে কারখানার লড়াই, খাদানের লড়াই, আমি তো লোক আনছি, কাজে লাগছি ঠিকাদারকে টাকা দিয়ে, ঝোপড়ি তুলে নিচ্ছি। ঠিক আছে, এরাও থাকবে। এদের মধ্যে বলিয়ে কইয়ে কে ?

—গনো ! এদিকে আয়।

ভারত বলে, আমরা আদিবাসী, তোমরা আদিবাসী, চলো আমার সঙ্গে। টাটা খুব খতরনাক জায়গা। আমাদের খেয়ে নেয়।

—হাঁ বাবু।

—একেবারে গাঁওলি ! "বাবু" কে ? আমি "দাদা", "ভরত দাদা।" যাক, ভাল হয়েছে আমার চোখে পড়েছ। গাঁ থেকে নতুন লোক এলেই কানাকানি চলে। কানাকানি চলছিল। সেই শুনেই তো উঠে এলাম। তুমি ?

—নাগেসিয়া !

—জানি না। আমরা রাজাঙ্কার লোক। ওখানে সবাই হো ! যাক, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তো ভাই বুঝে নাও, তোমার গাঁওলি আদমিরা বেঁচে গেল। এখন আমাদের যা হবে, তোমাদেরও তাই হবে।

—তোমার ভাল হোক।

—ঝোপড়ি বেঁধে নিতে পারবে?

—আমরা সবাই বেঁধে নেব।

—আমরা চলি।

—এ কে? কথা বলছে না?

—আমার ভাগনে লাগে।

—ওরই কেস-টেস আছে, না? মুখ দেখেই বুঝেছি। যাও, ট্রাকে-বাসেই যেতে হবে। আর কি!

বরজু গনোর হাত ধরে। বলে, এত আদিবাসী, সব গাঁওলি মানুষ, এদের সঙ্গেই থাকবি। আর···আর কোথাও ঢিপা দিস না।

ভারত জোঙ্কো বলে, ঢিপা আমি দিতে দেব না। কিন্তু ভাই! আমাকে না বলে কোথাও যাবে না। এখানে নানা লোক নানা মতলবে ঘুরছে। গাঁওলি আদিবাসী দেখলেই বলবে চলো খাদানে, দিনে দশ টাকা পাবে। চলো ইটভাটা, এত টাকা পাবে।

গনো বলে, তোমাকে কত দেব?

—আমাকে দেবে কেন? আমি তোমাদের মতই কাজ করব, মজুরি নেব।

এ ভাবেই খেড়া গ্রামের নাগেসিয়ারা মাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে টাটার উপান্তে ভাসমান, দেশান্তরী, দিনমজুরদের সমাজে মিশে যায় ও গনো বরজুকে বলে, কোনদিন খেড়া গেলে ঘরের উনোনগুলো ভেঙে দিস।

বরজু অসীম করুণায় বলে, ভুলে যা খেড়ার কথা। মালিক এখানে নতুন বসত করাবে। পারলে একটা নয়া খেড়া বানিয়ে নিস।

ভারত বলে, হাঁ হাঁ, যা দেখছ, ওগুলো কি ঝোপড়ি? সব গ্রামের নামে নাম।

—বরাবর থাকতে দেবে?

—না, টাউন বাড়ছে। এ সব জায়গা খেয়ে নেবে। তখন আবার কোথাও চলে যাব।

বরজু ও বিশাল একটি ধাবায় বসে ভাত খায়। তারপর পাটনা যাবার পথনির্দেশ নেয় ভারতের কাছে।

কৌয়ার কোন কথাই জানতে পারেন নি। ভাবতে গেলে এখনো মাথা ঘুরে যায়, অমানুষী ক্রোধে আগুন জ্বালাতে ইচ্ছা করে, দমাদম গুলি চালায়, সব কিছু করে দেয় ঝুঝার ও খেড়া।

রামাশ্রয়ের নির্দেশ মত বরজু ও বিশাল পাটনা স্টেশনে বসেছিল। মাথা ও মুখ গামছায় ঢেকে, কেননা কৌয়ারের ভকিল পাটনায় থাকে। ডালটনগঞ্জে ভকিল, পাটনায় ভকিল, কৌয়ারের সম্পত্তি ও আধিপত্য সুরক্ষিত রাখে।

রামাশ্রয় ওদের নিয়ে যায় একজনের বাড়ি। বোঝা যায় রামাশ্রয় আগে এসেছে ও এর বাড়িতে অপেক্ষা করছে। লোকটি রামাশ্রয়ের বয়সী হবে। সামনে কাচ ঢাকা টেবিল, তার ওপর বিছানো কাগজ। কাগজটি দেখে বরজু চেনে। এ তো বিশালের ও তার জবানবন্দী, নাগেসিয়াদের কামিয়ৌতির হিসাব।

রামাশ্রয় বলে, বরজু ভূঁইঞা, বিশাল ভূঁইঞা। এঁর নাম সাগর ভার্মা। বড় পত্রকার।

—পত্রকার কা হোতা হ্যায় পরসাদজী ?

—অখ্‌বরে লিখবেন, সজাই জেনে যাবে।

বিশাল বলে, কৌয়ারের কিছু হবে ?

—দেখা যাবে, দেখা যাবে বিশাল। সাগর ! এই বরজুর কাছেই শোন। কৌয়ার তার বাঘের খাঁচায় মানুষও ছুঁড়ে দিয়েছে। ওর কামিয়া মেয়ের বাচ্চাকে ফেলে দিয়েছে।

সাগর ভার্মা বলে, এ সব সত্যি ?

বরজু ঈষৎ হাসে। বলে, পাটনায় বসে আপনি লারাতুর কোন আন্দাজ পাবেন না বাবু।

সাগর ভার্মা বলে. গ্রেট স্টোরি হবে রামাশ্রয়। তবে কায়দা করতে হবে।

—কি রকম ?

—খুব হইচই ফেলে দিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয়, অল ইণ্ডিয়া কোন কাগজে যদি বড় কোন সাংবাদিক লেখে।

—তাই করো, তাই করো সাগর। পালামৌ যেখানে পড়ে আছে, সেখানে কি চলছে, একেবারে বর্বর সামন্তী যুগ। কোন কথা বাইরে বেরোয় না। আমার কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু পালামৌয়ের ওপর আলো পড়লে পর্দা ছিঁড়ে যাবে, আর তাই আমি চাই। কামিয়া এরা? এরা জনমদাস!

—লেখার মত লেখা হলে সে সাংবাদিকও দারুণ খ্যাতি পেয়ে যাবে।

—তুমি বোঝো, আমি ও জগৎ জানি না।

—লেফট উইং সাংবাদিক চাই।

—যাতে কাজ হয় তাই করো।

—আমি এদের কাছে ভাল করে জেনে নিই। তুমি তো বলতে পারবে আরো।

—তা পারব। তবে এদের কোন বিপদ হয় তা আমি চাই না।

—এরা থাকতে পারবে দু'একদিন?

—থাকতে তো হবেই। পালামৌ ফিরতেও পারবে না।

—তবে কি করবে?

—ভাবছি। কাকে ধরব, কাকে বলব এদের কোন খেটে খাবার ব্যবস্থা করতে।

বরজু বলে, আমরা টাটা চলে যাব।

—কি করবে?

—খেড়ার লোকরা যা করবে, তাই করব।

বরজু বলে, জীবন তো কেটে গেল। খাটলে কি একবার খেতে পার না?

সাগর ভার্মা বলে, এখানেই থাকো। তোমাদের কাছেও শুনব, তোমাদের ছবিও নেব।

রামাশ্রয় বলে, তাতে ওদের বিপদই হবে। ওদের ছবি ছেপো

না। ট্রাক ড্রাইভার জানে ওদের কোথায় নিয়ে গেছে। আমার নামটাও দিও না।

বিশাল বলে, তোমার নাম তো জেনে যাবে ও। খোঁজ করলে লোকে বলবে, আমি তোমার কাছে ছিলাম।

—মানা করলাম তোকে যেতে, শুনলি না।

—কুনারী বলল, একবার গাঁয়ে চলো। সেই জন্যে গেলাম। হা কুনারী! মরণ তোকে ডেকেছিল। সাগর বলে, চলো দোকান থেকে খেয়ে আসা যাক। আমার বাড়িতে তো কেউ নেই। আমি বাইরেই খাই।

—সবাই গেল কোথায়?

—বউ কলকাতায় ব্যাঙ্কের কাজে গেছে, ছেলেরা আছে বোর্ডিঙে। আমি একাই আছি। দেখি, যদি সব ঠিক মতো লেগে যায়, দিল্লী চলে যাব। বড় শহর ছাড়া সুযোগসুবিধে মেলে না। তুমি যে কি করে ওখানে পড়ে আছ!

—সবাই বড় শহরে থাকবে, ছোট টাউনেও তো লোক দরকার।

—যা বলেছ!

রামাশ্রয় দুদিন বাদেই ফেরে। বরজুরা চলে যায় টাটা। শিকড় উপড়ে গেলে গাছ বন্যায় ভেসে যায়। খেড়া ও লারাতু থেকে উৎপাটিত হয়ে বরজু আর বিশালও ভেসে গেল।

আর মাসখানেক বাদে, কৌয়ারের ভকিল চলে এল পাটনা থেকে।

—আরে, আপনি হঠাৎ?

—কাগজ দেখেন নি আপনি?

—খবরের কাগজ? হাঁ হাঁ আমি টাউনে গেলে ভকিলের বাড়ি "দৈনিক ভারত" পড়ে নিই। আমার ছেলে "মনোহর কহানিয়া" পড়ে।

—এসব কাগজ দেখেছেন?

—কি দেখব?

পাটনার ভকিল অতীব উদ্বেগতাড়িত হয়ে ডালটনগঞ্জ থেকে তাঁর

ভাইপোর ডাক্তার শ্বশুরের গাড়ি নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে! খুলেই দেখুন।

—ইংরিজি আমি কি বুঝব?

—এটুকু বুঝবেন। দেখুন, একসঙ্গে দুটো ইংরিজি, আর একটা হিন্দী কাগজে কি লিখেছে। এসব তো আমিও জানতাম না।

—কি লিখেছে?

—আপনার নাম দিয়েছে "লারাতুর মানুষখেকো।" বুঝলেন? "আদমখোর" বলেছে আপনাকে।

—কে? কে বলেছে?

—পত্রকাররা বলেছে?

—তারা কারা?

এসব নাম···দীপক সিংহ ··খুব নামকরা লোক···রাজস্থানে সেচ-মন্ত্রীর কেচ্ছা লিখে তুফান তুলে দিয়েছিল। প্রকাশ ভার্মা···নাম কখনো শুনি নি। আর···

—আদমখোর? আমি মানুষ খাই?

—আপনি মানুষ, বাচ্চা, আওরত মেরে আপনার বাঘকে খাওয়ান? কামিয়া মেয়েদের ইজ্জত নেন, আর মেরে ফেলেন? ইস্কুল, হাসপাতাল, কিচ্ছু করতে দেন নি লারাতুতে? পুলিশ ঢুকতে দেন না জমিদারীতে? সরকারী ফরেস্টের গাছ বিক্রি করেন?

—কে? কে বলেছে এসব?

—আপনার শিকারখানায় কুনারী ভুঁইন আর তার বাচ্চাকে....

—বরজু!

—এত খবর, যে লিখেছে, পরের রবিবারও এসব খবর বেরোবে।

—মানহানির মামলা করব।

—কার সঙ্গে? এসব দিল্লী আর এলাহাবাদের কাগজ। পাটনায় তো খুব কথা উঠে গেছে। আর আপনার দখলে তো সবচেয়ে বেশি জমি। একটা "গয়ের মজুরোয়া" জমি নিয়ে ধরমবীর সিংয়ের সঙ্গে আপনার বিবাদও ছিল, ব্যাপারটা বুঝলেন?

—কি বুঝব? বেটার জমি বাপেরও নয়, দাপেরও নয়। তাতেই তো সবাই, বাপবেটা অ্যাডভোকেট হয়ে পয়সা কামায়! জমি খরিদ করে! ছোঃ!

—একটু শান্ত হোন, একটু বুঝুন। সে "ধরমজ্যোতি" কাগজ বের করে, সে এসব খবর ছেড়ে দেবে?

—ওর প্রেস জ্বালিয়ে দেব।

—রাঁচি গিয়ে?

কৌয়ারের হাত দুটি অতিরিক্ত লম্বা, চেহারা পিটানো, শক্ত। গোঁপ ঝাঁপালো এবং কণ্ঠস্বর অতিরিক্ত মোটা।

—তব কা কিয়া যায়? এত বদমায়েশি তো সহ্য করা যায় না।

—আপনি তো কথাই শোনেন না। কতবার বলেছি, দিনকাল বদলে যাচ্ছে, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখুন।

—দিনকাল আপনার পালটাতে পারে ভকিলসাব! পরমজিৎ সিং কৌয়ার দিনকাল মানে না। আপনি কি ভাবছেন? কেস ঠুকে দিন।

—কার নামে?

—ধরমবীর সিং! আবার কে? যত খবর দিয়েছে, সব ওর জানা খবর। বরজুকে ওই নিয়ে গেছে।

—বরজু কে?

—আমার কামিয়া। শিকারখানায় কাজ করত।

—ধরমবীর সিং খবর দিয়েছে, কোন প্রমাণ আছে?

—আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

—বহোত বড় শোর উঠবে কৌয়ারজী! খবর পড়ে লোকজন, পত্রকার সব, চলে আসবে লারাতু।

—কোন সরকারী অফসরকেই ঢুকতে দিই না, পত্রকার আসবে? কোন সাহসে?

ভকিল এবার মাথা নাড়েন। বলেন, প্রেসের কোন লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে প্রেস ছেড়ে দেবে না। দিল্লীর সরকার, পাটনার

সরকার, প্রেসকে চটাতে চায় না। কি উলটাপুলটা লিখে দেবে, তখন বদনাম আরো ছড়াবে।

—দিন কাগজগুলো।

—নিন। আপনার জন্তেই রেখেছি। হিন্দী অখবর পড়ে কৌয়ারের মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল। এসবের মূলেই যে ধরমবীর সিং সে ধারণা পাকা হয়ে গেল সে সপ্তাহের "ধরমজ্যোতি" পড়ে।

বরজু ও বিশাল যেহেতু ভূঁইঞা, সেহেতু অন্যান্য ভূঁইঞা কামিয়াদের ঘর জ্বালিয়ে শিক্ষা দেবার শুভ সংকল্প তাকে ত্যাগ করতে হয়। কেন না ডালটনগঞ্জের ভকিল বলে, এমন কদম উঠাবেন না যা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

"লারাতুর মানুষখেকো কৌয়ার"-এর বংশের বিভিন্ন জুলুমি ইতিহাস, তার দাসমজুর সংখ্যা, তাদের অবস্থা, সবই পর পর তিন কিস্তিতে বেরোয়।

পাটনা বিধানসভা হইচই ফেলে দেয় কম্যুনিস পার্টি সদস্যরা। তারা দাবী জানায়, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক।

বরজু প্রদত্ত বয়ানটি সম্পূর্ণ বেরোয়। শিকারখানায় কারা কবে বাঘের খোরাক হয়েছে, তাদের নাম ও ঠিকানা থাকে। সত্তরের দশক খুব অস্থির সময় ছিল বিহারে। বিহারেও নকশাল আন্দোলন, তাদের সমর্থকও ছিল। "ধরমজ্যোতি" কাগজের মালিক যদিও রাজপুত এবং দাস মালিক, সে কৌয়ারকে অপদস্থ করবার সুবর্ণসুযোগ ছাড়ে না। লেখে, "পরমজিৎ সিং কৌয়ার পালামৌ, তথা বিহারের নাম কলঙ্কিত করেছে।"

দিল্লীতে পার্লামেন্টেও কথা ওঠে।

রামাশ্রয় বউকে বলে, যাক! পালামৌয়ের নাম জানিয়ে দেওয়া গেছে গোটা দেশকে।

—খুব সাবধান!

—হ্যাঁ সীতা! আমি জানি, এ সময়টা আমাকে সাবধানে চলতে হবে। কাগজে আমার নাম তো ওঠে নি।

ধরমবীর সিং একদিন রামাশ্রয়ের প্রেসে আসে।

—কি ছাপছেন এখন?

—পালামৌ কে বনৌষধি।

—কৌই কিতাব?

—হ্যাঁ। বৈদ্যাচার্য কল্যাণ শাস্ত্রী লিখেছেন।

—টাকা দেবেন তো?

—হ্যাঁ, ওঁর কয়েকটা বই তো ছাপলাম।

—ভাবছিল "ধরমজ্যোতি" আপনার প্রেসে ছাপা যায় কি না।

—বহোতই ছোট প্রেস ধরমবীরজী!

—একটা কথা বলবেন?

—কি কথা?

—কোয়ারের খবর ওরা পেল কোথা থেকে?

—সবাই বলছে, আপনি খবর দিয়েছেন।

—যে কামিয়াটার বউকে নিয়ে এত কথা, সে তো আপনার কাছেই থাকত।

—থাকল আর কোথায়? বউ বাচ্চা নিয়ে চলে গেল গাঁয়ে, এলই না।

—আপনার কাছেই এখান ওখান থেকে লোক আসে। কি সব সভা হয়।

—সাহিত্যসভা।

—তাজ্জব ব্যাপার! কোয়ার আমার ওপর ক্ষেপে আছে। আমি প্রায় সব ঘটনাই জানি, কে না জানে?

কিন্তু আমি কেন রাজপুত হয়ে রাজপুতের নামে খবর দেব? দীপক সিংহ···জীবনে নাম শুনিনি। সে সব খবর পেয়ে গেল?

—খুব রহস্যময়।

—খুবই। আচ্ছা, চলি। মেয়ে না কি ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে।

—সে তো আপনার নাতনিও।

ধরমবীর সস্নেহে বলেন, যতদিন বিয়ে না হচ্ছে পড়ুক।

—পড়া ছাড়িয়ে দেবেন ?

—বিয়ে আগে, না পড়া আগে ?

—আমি তো মেয়েকে পড়াতে চাই।

—অফসর বানাবেন ?

—ইচ্ছে তো তাই। দেখি…

—ওসব আমাদের ঘরে চলে না। আর জামাই খুঁজব পলিটিস-ওয়ালা পরিবারের। পয়সা এখন পলিটিসে। দেখতে তো পাচ্ছি।

কিন্তু দিল্লীতে তো দাসমজুর প্রথা নিয়েও কথা ওঠে। এ রকম চলবে কতদিন ? এ প্রথা বন্ধ হবে কবে ? গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশন ও ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট বুলেটিন থেকে ভারতে রাজ্যে রাজ্যে দাস-মজুরদের সংখ্যার হিসাব সাংসদদের চমকিত করে। আর, লারাতু অভিযানে চলে আসে এক ক্ষমতাশালী কমিটি, যাতে থাকে সাংবাদিক, নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির লোকজন, সরেজমিনে তদন্ত করতে।

পালামৌ জেলা কমিশনার কৌয়ারকে জানান, এঁরা যাচ্ছেন, আপনি সহযোগিতা করবেন।

লারাতুতে থানা বা পোস্টাপিস বা হাসপাতাল নেই। ব্লক অফিস অকর্মক ও পরিত্যক্ত, এ সব বিষয়ে সকল প্রশ্নই কৌয়ার সদম্ভ তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দেন।

ঝুঝার গ্রাম জ্বালিয়ে নতুন প্রজা বসিয়েছিলেন আপনারা, কেন ?

—পায়ের জুতো যখন পা ছেড়ে মাথায় উঠতে চায়, তখন সে জুতো ফেলে দিতে হয়।

সাংবাদিকরা অত্যন্ত অবাক।

কৌয়ার বলে, আপনারা সত্যিমিথ্যে না জেনে আমার সম্পর্কে যা তা লিখলেন ?

—কোন খবরটা মিথ্যে ?

—ছ'হাজার একর জমি ? জঙ্গলটাও জমি ?

—যা থেকে টাকা পান, সেটাও তো জমি।

—নেই কার? আমার নামই লিখলেন?

—আর হাজার কামিয়া?

—সে তো রাখতেই হয়। রাজপুত কি চাষ করবে?

—কামিয়ৌতি যদি সরকার তুলে দেয়?

—ভারত সরকার কি করবে, আইন? আইন করে এত পুরনো নিয়ম তুলে দেবে? কাজে কিছু হবে না। কেন হবে না জানেন? এদের কোন জমি নেই, জিলামে কোই ইনডাস্ট্রি ভি না হ্যায়, কাম কাঁহা? কেয়া খায়ে? উসি সে সমঝ লিজিয়ে।

—এদের জমি ছিলই না?

—সবই তো আমাদের খাতায় উঠে গেছে।

—কুনারী ভুঁইনের কথা বলুন।

—আমি কি জানব?

—আপনার জঙ্গল থেকে সে কোথায় গেল?

—ও সব ছোটজাতের মেয়ে, কার সঙ্গে ভেগে গেছে।

—আমাদের খবর তা নয়।

—কি খবর আপনাদের?

—বরজু ভুঁইঞা বলেছে, আপনি মা-ছেলেকে বাঘের খাঁচায় ফেলে দিয়েছেন।

—কাকে বলেছে?

—কাউকে বলেছে। জবানবন্দীতে টিপছাপও দিয়েছে।

—বরজু!

—শিকারখানার বাঘকে আপনি মানুষ খেতে দেন?

—এ সব কথার জবাব দেব না।

—লারাতুতে কোন স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা নেই কেন?

—হাসপাতাল কি হবে? বিমারি তো হয় না। স্কুল? আমাদের ছেলেমেয়ে টাউনের স্কুলে যায়। এরা কি মানুষ? ক্ষেত চষবে, মোষ চরাবে, স্কুল দিয়ে ওদের কি হবে?

—ব্লক আপিসকেও আপনি কাজ করতে দেন না।

—না। সরকারী আপিস এলাকায় ঢুকে গেলে হাওয়া বদলে যায়। আমি থাকতে সে হতে দেব না।

পরবর্তী রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে অতি কঠোর সমালোচনা করে, জেলা প্রশাসনকে ধুয়ে দেয় একেবারে।

কৌয়ারকে বলে, লোকটা ভারত স্বাধীন হয়েছে তাই মানে না। পালামৌকে বলে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত জেলা। কৌয়ার-এর নিজস্ব ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, বে-লাইসেন্স বন্দুকের সংখ্যা, বনদপ্তর ও সেচ-বিভাগের জমি বেদখল, এবং কৌয়ারের লালসার বলি মেয়েদের হিসাব, সবই দিবালোকে আসে। রিপোর্ট বলে প্রশাসন রাজপুতদের হাতে। পুলিশের মাথা রাজপুত। সে জন্যই চলছে এই শ্রেণী-শোষণ।

ফেরার সময় বরুণ আগ্নেয় রামাশ্রয়কে বলে যায়, এর বেশি পারলাম না।

—ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

কৌয়ারের জীবনে আসে দুঃসময়। ডি. সি. ওকে ডেকে পাঠান ও বলেন, হাসপাতাল, সাতটা প্রাইমারি স্কুল, হরিজন মিশন অফিস হবে। রাস্তা হবে, বাস চলবে। ডেভলপমেন্ট কাজ হবে। বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।

—কেন, কেন শত্রুতা করছেন?

—সব জায়গায় হচ্ছে, লারাতু কি দেশের বাইরে? অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

—আপনি সর্বনাশ ডেকে আনবেন।

—আপনি পাগল।

—কোন ডি. সি. যা করে নি…

—আমি তা করব।

—আর কি সর্বনাশ করবেন?

—যান, বিরক্ত করবেন না।

—আমার জমিতে নয়।

—মৌজা ম্যাপটা দেখে নেবেন। সরকার তার নিজস্ব জমিতে যে কোন কাজ করতে পারে।

কৌয়ারের সামনে দিয়ে মালবাহী-ট্রাক ঢোকে, কাজ শুরু হয়। পরাজয়, পরাজয়!

বনদপ্তর ও সেচবিভাগ রুজু করে মামলা। মামলা যে হয়, এতেই কৌয়ারের নাক কাটা যায়। কৌয়ারের বউ রাঁচিতে চিঠি দেন।

কৌয়ারের শালারা আর্মি অফিসার, কারখানামালিক। তাঁদের রাঁচিতে হাবেলি, ছেলেমেয়ে ইংরিজি ইস্কুলে পড়ে, বউরা গাড়িতে বেড়ান।

কারখানামালিক দাদা চলে আসেন লারাতু। কৌয়ারের বিষয়ে এত লেখালেখিতে তাঁরাও অপমানিত। কৌয়ারের স্ত্রী দাদার কাছে কান্নাকাটি করেন।

—বুঝান ওঁকে, সমঝে চলতে বলুন। মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের বউ আনতে হবে। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, উনি তো মানবেন না।

—কান্নাকাটি করে কি লাভ?

—টাউনে থাকলেও কত কাজ করতে পারেন।

—আমি কথা বলব।

কৌয়ারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

—আপনি কিছুদিন এ সব ভুলে যান।

—কি করব?

—পলিটিস করুন, ঠিকাদারী করুন। এখন সবাই যা করছে তাই করুন।

—জমিন্ হল আসল সম্পদ।

—বেশ তো! মানলাম! কিন্তু এখানকার মাটি তো সুফসল দেয় না।

—দেবে, দেবে।

—তবে ট্র্যাক্টর আনুন। সারখাদান দিন। উন্নত বীজ আনুন।

—ও সব মডার্ন জিনিস আমি করব না। বাপ-দাদা যা করে গেছেন, আমিও তাই করব।

—তবে ছেলেকে রাঁচিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। চাই কি, বড় অফিসার হয়ে যাবে।

—কি দরকার?

—কি বুঝাব আপনাকে? আপনি যা চান, সব পেয়ে যাবেন পলিটিস করলে।

—আমার জন্যে ভাববেন না। ছুটি নিয়ে এসেছেন? আপনার তো ছুটি নেই।

—কারখানা চালালে ছুটি থাকে?

—আপনি কারখানার গোলাম। আমি কারো গোলাম নই। আমার সময় আমার নিজের। জঙ্গলটা দেখেছেন? ঘোড়ায় চেপে শিকার খেলতে কত মজা তা জানেন?

—মানুষ শিকারেও মজা?

—বহোত মজা রাহুলজী! সবচেয়ে মজা মানুষ শিকারে।

কৌয়ারের চোখ স্বপ্নধূসর হয়ে গেল, গলা নেমে এল।

—আমার পূর্বপুরুষ আমাকে দিয়ে গেছেন তাঁদের রক্ত। মানুষ শিকার করার জন্যে রক্ত ক্ষেপে ওঠে, কি করব বলুন? কামিয়াগুলোর রক্তে আর তেজ নেই। ওরা আর রুখে ওঠে না। যখন রুখে উঠত, তীর চালাত, কুড়াল-টাঙি-বর্শা-বল্লম চালাত, তখন তাদের মারতে, তাদের ঘর জ্বালাতে সে কি আনন্দ কি বলি আপনাকে! ওদের রক্ত থেকে তেজ চলে গেল, রুখে ওঠে না, বহোত আফশোস, বহোত হি আফশোস!

—রুখে ওঠে কৌয়ারসাহেব, প্রতিবাদও করে। নইলে আপনার কামিয়ারাই তো সব খবর ফাঁস করে দিল। তাতেই তো এত গোলমাল হল।

—হাঁ, সে জন্যেই লারাতুতে সরকারী লোক ঢুকছে, সব ডেভেলপমেন্ হচ্ছে, তাও জানি।

—এখন দিন পালটাচ্ছে, লড়াইয়ের চাল পালটে যাচ্ছে।

—ভাববেন না ওই অখবরওয়ালা আর হাল্লাবাজরা আর সরকার জিতে গেল। আমি আবার দেখিয়ে দেব কৌয়ার কৌয়ারই আছে।

তাঁর শ্যালক নিঃশ্বাস ফেলে বোনকে বললেন, কোন লাভ হল না।

—এটা আমার নিয়তি।

—রাজপুত ঘরে স্বামী যা করবে সেটা মেনে নেওয়াই নিয়ম। তুমিও মেনে নাও, কি করবে?

কৌয়ারনী সদুঃখে বললেন, আমার জীবন তো কেটে গেছে। মেয়েদের বিয়েও দেবেন লাঙল-ভৈঁসা-কামিয়া দেখে। তারা কেমন করে জীবন কাটাবে। ছেলে তো বাপেরই মত। মেয়েরা তো তা নয়। গোমতী বলে, মা আমি অনেক পড়ব। বিপাশা বলে, মা আমি গান শিখব। কোন আশাই কি মিটবে ওদের?

—আমাদেরও তো বিশ্বাস করেন না। রাঁচিতে রাখলে আমাদের মেয়েদের সঙ্গেই পড়তে যেত।

—তা দেবেন না।

—মা, বলেন, তোমাকে একবার যেতে।

কৌয়ারনী বলেন, জঙ্গলে বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, এখন এসব বলে লাভ? এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে ঢুকেছি, মরে গেলে বেরোব। ভেবেছেন কি, মেয়েদের কপাল অন্যরকম হবে? হবে না।

—আমি ওদের নিয়ে আসব একবার।

—আনবেন। যাক! তবু রাস্তা হচ্ছে, বাস চলবে! ডালটনগঞ্জ কি টাউন? রাঁচির কাছে, পাটনার কাছে তো কিছুই নয়। কিন্তু যে কবরখানায় থাকি, ডালটনগঞ্জ গেলেও মনে হয় কত বড় শহরে এসেছি।

—লারাতুও টাউন হয়ে যাবে। পালামৌয়ে টাউন আর কোথায়?

—হয়তো হবে, আমি কি দেখে যাব!

দাদা চলে গেলে কৌয়ারনী খুব কান্নাকাটি করেছিলেন, খুব দাপাদাপি।

॥ চার ॥

আজও কৌয়ারের মনে আছে স্ত্রীর আচরণকে উনি বিদ্রোহ বলেই মনে করেছিলেন। তশীলদার তাঁর কর্মচারী, আত্মীয়, পরামর্শদাতা, সবই বটেন। একই বংশজ, সম্পর্কটি যদিও দূরের। কাগজে লারাতু সমাচার বেরোবার পর যে হইচই হয় তাতে সে সময়টা তাঁর দুর্গ্রহ চলছিল এ তো বোঝাই যায়।

যে জ্যোতিষী তাঁর কুলজন্ম পত্রিকা করেছিলেন তিনি এখন রাঁচিতে এক বিহারবিখ্যাত গ্রহরত্নাচার্য। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে একমাস বাদে সময় দেন। যেসব রত্নাদি ধারণ করতে বলেন, তাও তাঁর কাছে নিতে হয়। বিহারে ভোট ঢোকার পর থেকে প্রথমে তাঁর পিতা ও পরে তিনি নেতাদের কোষ্ঠীবিচার করে যাচ্ছেন। রাঁচি-ধানবাদ-জামশেদপুরের শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, ডন ও মাফিয়া, সকলেই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। মাফিয়ারা তাঁকে দেহরক্ষী দেয়, শিল্পপতি দেয় গাড়ি, জঙ্গল-ঠিকাদার বানিয়ে দেয় বাড়ি, এখন তিনি অমরনাথ তীর্থের মতই দূরদুর্গম কৌয়ারের কাছে।

কৌয়ার বলেন, ধোঁকেবাজটাকে মেরে ফেললে আমার রাগ যায়। যখন কেউ নাম জানে না, তখন হাজার টাকা দিয়ে জন্মকুণ্ডলী বানাই নি আমার? একবারও বলেন নি যে মন্দ সময় আসছে, বলেন নি ঘরওয়ালী চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। ওকে মারাই দরকার।

তশীলদার বলে, সে খুব ভাল কথা। কিন্তু সময়টা খারাপ যাচ্ছে, ব্রহ্মহত্যা করবেন? মুখ্যমন্ত্রী ওর কথা না শুনে একটা মকান কেনে না, আর সিংহানিয়াদের টান্‌সপোর্ট বিজনেসও ওঁর দৌলতে। এখন ওঁর ক্ষতি করতে গেলে আপনার জাতভাইরাই রুখে যাবে।

—সবাই খচড়া হয়ে গেছে।

—পত্রকারদের সঙ্গে অত রুখা-সুখা বাত করলেম বলে তো ওরা চটে গিয়ে আরো লিখল।

-তুমিও এসব কথা বলছ ?

—আমি ছাড়া আপনার মিত্র নেই। আপনার মত আমার রক্তেও আগুন জ্বলছে।

—কিছু তো করো!

—কৌয়ারিনের কথা কি বলছিলেন ?

—সেও তো রুখে গেছে। মেয়েদের পড়াচ্ছ, টাউনে অফসর ছেলে দেখে বিয়ে দাও। ছেলেকে শহরে বিয়ে দাও, ওকে অফসার বানাও। এই গরু-ভৈঁসা-ক্ষেত-আনাজ-কামিয়া-জঙ্গল এর মধ্যে ঠেলে দিলে ওদের জীবন বরবাদী হয়ে যাবে। আমার মতো পিঞ্জ্‌রায় বন্ধ থাকলে মেয়েরা মরে যাবে।

—খুব দুর্দিন আপনার!

—ঘরের ঔরতের কথা কোন্ কৌয়ার শুনেছে ? একজনকে মেরেছে, আবার শাদি করেছে।

—এখন তা করলে কৌয়ারিনের ভাইরা আছে, এ খবর নিয়ে আবার হইচই তুলবে "ধরমজ্যোতি।" আর, লারাতুতে এখন লোক বাড়বে, চায়ের দোকান হবে, বাস চলবে, খবর চালাচালি হবে, সরকারী যত কিছু হবে, বাইরের নানা জাতের লোক আসবে। পুরানা নিয়মে চলা কঠিন হবে।

—আমি কি হাত পা বেঁধে ঘরে বসে থাকব ?

—তা কেন ? আপনার পিতা, স্বর্গবাসী কৌয়ারের বরষি করুন ধুমধাম করে। খেড়াতে নতুন প্রজা বসান।

—পুলিশ থানাও হবে, চারটে চৌকিও বসাবে।

—বসাক না। পুলিশ জানে কাকে খুশি রাখতে হবে। এখন আর আমরা লোক পাঠাব না। আমাদের কাজ পুলিশ করবে।

—আর ?

—টাউনে শত্রু কে ?

—ধরমবীর সিং। মৈনপুরের সুজা সিং, বিষাণপুর এস্টেটের কৈলাস সিং।

—পাঁচশো একর, তিন হাজার একর, হাজার একর, জমিতে ওরা লারাতুর অনেক নিচে।

লারাতু তো পালামৌতে সুরজ। সূর্যবংশী, ঔর প্রতাপে সুরজ।

—তব ভি ওরা টাইমের সঙ্গে চলতে জানে। সবাই সরকারের কণ্টাক্টর। টাউনে থাকে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকে না। কৈলাস সিংয়ের ভাতিজারা অ্যাডভোকেট।

—কেন বলছ এসব?

—শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে নিন।

—কৈসে? ওদের পায়ে পাগড়ি রাখব?

—কিসের জন্যে? ধরমবীরের মেয়ের সঙ্গে অমরজিতের শাদি দিন। বিশ বছর উমর, রক্ত বহোত্ গরম!

—তশীলদার!

কৌয়ার একটি পিতলের ফুলদানি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তশীলদার সেটা শূন্য থেকেই লুফে নিল ও টেবিলে রাখল। হাতজোড় করে বলল, লারাতুর ভালাই হবে।

—শত্রুকে দিয়ে?

—মালিক পরোয়ার। লড়াইয়ে কখন শক্তি দরকার, কখন বুদ্ধির তা বুঝতে হয়। আপনি তো যত অপমান হল, তা সয়ে যাবেন না।

—না, জ্বালিয়ে দেব।

—আমিও তাই চাই। আর তখন তো শক্তি দিয়ে শত্রু দমন করবেন।

—নিশ্চয়।

—ধরমবীর আবার লিখবে, আবার শোর উঠাবে নিশ্চয়। ও পলিটিসে যেতে চায়।

—যাক! আমি ওকে···

—না মালিক, না! রাজপুতদের একাট্ঠা থাকতে হবে। ধরমবীর বংশে ভাল। জমি কম, কিন্তু রোজগার অনেক করে। আমি এ কথাও শুনেছি যে ও সমাজের কাছে খুব অপদস্থ হয়েছে লেখালেখি করার

জন্যে। ও আপনার কাছে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। কিন্তু পথ খুঁজছে খুব।

—কে বলল?

—আমার কানে সব আসে খবর। আমাদের ভকিলকেই তো বলেছে। বলেছে কৌয়ারের কাছে ক্ষমা চাইব, সাহস পাচ্ছি না।

—তাহলে কি বলছ?

—মেয়ে তো বংশে একটা। তার বিয়ে হলে জীবনে ও আপনার শত্রুতা করবে না। ওদের বংশে পুলিশ অফিসার, অ্যাডভোকেট কি নেই? মেয়ের বিয়ে হলে আপনার বন্ধু ওর বন্ধু হবে, আপনার শত্রু ওর শত্রু হবে। আর আপনি অনেক কুটুম্ব পাবেন। লোকবল তো দরকার। খুব ভেবেচিন্তেই বলেছি।

—ভাবি, ভেবে দেখি।

—মেয়ের মামা এমেলে, সেটাও ভাববেন।

—ভেবে দেখি। কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা তো আমরা বলতে পারি না।

—আপনি কেন এ কথা ভাববেন? আপনার সম্মান রেখে সব কাজ ওরাই করবে। ভয় ঢুকে গেছে ওর বংশের লোকদের মনে। সে তো নিজেই বলছে যে আমি এ কি করলাম? পূর্বপুরুষরা বলে গেছে—

লারাত্তু সে দুশমনি উঠাও
পালামৌ সে ভাগ যাও।

কৌয়ার দাঁত ঈষৎ বের করেন। এটাই ওঁর হাসি। বলেন, সে কথা মনে পড়েছে তাহলে?

—মেয়ে তো অপছন্দের নয়।

—ভাবি, ভেবে দেখি।

—রাজপুত বিরাদারিকে এখন একাট্‌ঠা হতেই হবে। নইলে ব্রাহ্মণ পাণ্ডেরা ছাটন আর মহুবনিয়া এস্টেটের মালিকও হয়েছে, জমিও বাড়াচ্ছে, এ তো চিন্তার কথা।

—ব্রাহ্মণ পাণ্ডেদের জন্যেও চিন্তা করব?

—সব পলিটিসে ঢুকছে। নইলে মুক্তেশ্বর পাণ্ডে রাজ্যমন্ত্রী হতে পারে ?

—পলিটিস মে হ্যায় কা ?

তশীলদার মনে মনে বলে, হায় মূর্খ !

মুখে সবিনয়ে বলে, আজকাল পলিটিসই তো সব মালিক !

—পলিটিস ?

—পলিটিস রাঁকা ভিখারীকে রাজা বানায়। রাজাকে করে রঙ্ক ! আর বিহারে পলিটিস মানে জাতের লড়াই। নিজেদের মধ্যে যত বিবাদ থাক, জাতের উপর চোট এলে একসঙ্গে থাকতে হবে। সুজা সিং আর কৈলাস সিংও এক কথাই বলছে। কেন বললাম, তা বুঝছেন নিশ্চয়।

—মৈনপুর এস্টেট, বিষাণপুর এস্টেট !

—দুশমন এখন, কিন্তু সে তো হোরির সময়ে হয়েছিল, আর তিন পুরুষ আগে। এখন পলিটিস অনেক রকম। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে গরমেন ছোট জাতকে আনছে, খারোয়ার আদিবাসীরাও বলছে ওরা পালামৌ দেশে আদি রাজা ছিল। রাঘব খারোয়ার তো খুব নেতা বনেছে।

—পায়ের জুতোকে গরমেনই মাথায় পাগড়ি বানাচ্ছে।

—দুই মেয়েকে যদি মৈনপুর আর বিষাণপুরে বিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে দিয়ে রাজপুত বিরাদরির খুব মঙ্গল হবে। লারাতু আবার গৌরব ফিরে পাবে।

—মৈনপুর ! বিষাণপুর !

—সুজা সিংয়ের তো ছেলে নেই, ভাইপোকে গোদ নিয়েছে। আর কৈলাস সিংয়ের দু'ছেলের বিয়ে হয়েছে, ছোট ছেলে তো আছে।

—বিপাশার চেয়ে সামান্যই বড় হবে।

—রাজবংশে কতসময় এমন হয়েছে।

—হ্যাঁ···ক্ষেত-ভৈঁসা-জঙ্গল এস্টেট !

—সকলের তো একটা হুতাশ আছে যে সুরজ বংশের সঙ্গে কাজ হলে সম্মান বেড়ে যায়। অবশ্য, আপনি যদি মেয়েদের জন্যে শহরে জামাই খোঁজেন···

—আমি নয়। কৌয়ারনী!

—আপনার শালারা কি বলবেন জানি না।

—তাদের কথা শুনব আমি? কখনো নয়।

—কৌয়ারনী খুশি হবেন না।

—মেয়ের মালিক কে? আজ বাপ, কাল স্বামী, অন্তিমে ছেলে! যাও তুমি, ভেবে দেখি আমি।

তশীলদারই এ সময়ে লারাতুর কৌয়ারমহলে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কৌয়ার তার কথামতই কাজ করেন।

লারাতু এতকাল, এই অন্ধকার পালামৌয়েও নিজস্ব বৃহত্তর অন্ধকারে গোপন ছিল। প্রথমে কুনারী ভুঁইনের হত্যা নিয়ে হইচই হল। কাগজে লেখালেখি হল। সার্চলাইটের নিশানা ঘুরে গেল লারাতুর দিকে। এই রোড নির্মাণ, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ লারাতুকে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে বর্তমান বর্বর, হিংস্র সময়ে আনবে। এই লারাতুতেও মধ্যযুগই বহাল থাকবে, কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটবে শুধু।

তশীলদার পথ ও পরিবহন ব্যবস্থা সুনাম হলে, আগেই খুলবে কাঠ চেরাই কল এবং কাঠের কারবারে নামবে। তশীলদার তার ছেলেদের টাউনে রেখে পড়াচ্ছে. ওদের চাকরিতে ঢোকাবে। কপালে থাকলে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা করবে। পরমজিৎ সিং কৌয়ার থাকুক, লারাতুর মধু চুষে নেবে তশীলদার। সেজন্য খুব দরকার কৌয়ারের মনকে সাংসারিক কর্তব্য পালনে মনোযোগী করা।

॥ পাঁচ ॥

ধরমবীর সিং, কৌয়ারের ভকিল একা নয়, তশীলদারের সঙ্গেই কথা বলেছিল টাউনে।

—আমি তো খুব হকচকিয়ে গেছি এত এত খবর! এ সব আমার জানাও ছিল না।

ধরমবীর, ভকিল, তশীলদার তিনজনেই পুরনো অথচ চিরনবীন চিত্র 'নাগিন' দেখে বেরিয়েছিল এবং দোকানে পান খাচ্ছিল।

ধরমবীরের কথা শুনে ভকিল বলল, সেটা তো আইনের চোখে অপরাধ। খবর আপনি জানেন না, ছাপল "ধরমজ্যোতি"?

—"ধরমজ্যোতি" বড় কাগজের খবর লিফ্‌ট করেছে।

তশীলদার বলল, ছেপেছেন, বেশ করেছেন। এখন ভাবছেন কেন? কৌয়ারকে অপদস্থ করতে চেয়েছিলেন, করেছেন।

ধরমবীর বলল, আরে তশীলদার! ওহি তো কথা। কৌয়ারকে অপদস্থ করতে চাই নি, হয়ে গেছে। এখন শত্রুতা মিটাতে পারলে বাঁচি।

—দিল্লীর কাগজ বা খবর পেল কোথায়?

—কি বলব? বিশাল ভুঁইন রামাশ্রয়বাবুর বাড়ি থাকত। সেখান থেকে সে কবেই ভেসে গেছে। এখন বিরাদরিতে কথা উঠে গেছে, এমেলে, রাজ্যমন্ত্রী, আমার দাদা, সবাই বলছেন রাজপুত হয়ে রাজপুতের পিছনে লেগে অন্যায় করেছ। আমাকে বাড়িতেও কথা শুনতে হচ্ছে।

তশীলদার, পানের দোকানে সজ্জিত বৈজয়ন্তীমালার ছবি দেখতে দেখতে বলল, রাজপুতজাতির মধ্যে নেই একাট্‌ঠা। ওদিকে দেখুন, বরজ্‌ করল অন্যায় আর গ্রামবাসীরা পুরা খেড়া গ্রাম উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। ওদের একতা দেখুন। আমরা জাতিগর্ব ভুলে যাচ্ছি সবাই।

—তবে কি করতে হবে?

—ক'টাই বা রাজপুত বংশ! এ সময়ে যে-যার সঙ্গে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে, বা যে ভাবে হোক, একটা সম্বন্ধ করে নিলে কি একটা শক্তি হত! সবাই ভয় পেত, সবাই মানত।

ধরমবীর সিং বললেন, আমাদের মধ্যে তো আছে। স্বর্গবাসী কৌয়ারের সময়েও ছিল। এ কার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে?

—উনি এখনকার চালতরিখা তো বুঝেন না। তবে অমরজিৎ

বাপের মত হবে না। ও কন্টাক্টরি করবে, কারবার করবে, বহোত হি আইডিয়া ওর।

ভকিল বলল, শাদির কথাও ভাবছেন কৌয়ার।

তশীলদার বলল, ওই তো বললাম, সুরজবংশী ঘরের মেয়েও ভাল, ছেলেও ভাল। কৌয়ারের শালারা তো কতই সম্বন্ধ আনছেন রাঁচি, ধানবাদ, টাটা থেকে। কৌয়ারের এক কথা, জিলায় খোঁজো। দেখি, ভকিলবাবু দেখবেন।

—ছেলের জন্মপত্রিকা ভাল?

—খুব ভাল।

—মেয়েরা শুনেছি দেখতে ভাল।

—ছেলেকে তো আপনি দেখেছেন, কৌয়ারের চেহারা তবে রং পেয়েছে মায়ের।

যোগফলটি খুব নয়নশোভন হয় নি, তবে ধরমবীর সেকথা বলেন না। বলেন, সে তো সবাই জানে। বড় ঘর, বড় বংশ, রাজপুত ছেলের চেহারা দেখে কে?

ভকিল বলে, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন?

—ভাবছি সবাই। ওর মায়ের জেদ, যে লাডলী বেটিকে দূরে বিয়ে দেবে না।

—দেখুন। দেখতে থাকুন।

—জিলায় দেখলে তো সব ছেলেই চেনাজানা। মেয়ে আজকাল সিনেমা দেখে, মাকে বলেছে মডার্ন বর চাই। আরে! সংসার করবি, ছেলে মানুষ করবি, মডার্ন বর থাকলেও তাই করবি, মালিক বংশে গেলেও তাই। আমারও তো ইচ্ছা করে যে যেতে আসতে মেয়েকে দেখতে পাব, এমন ঘরে দিই। পান নিবেন?

—না ধরমবীরজী আমরা চলি।

টাউনে তশীলদার কৌয়ারের বাড়ির আউটহাউসে মা, বউ, ছেলে-মেয়ে রাখে। সেদিকপানে চলতে চলতে ও ভকিলকে বলল, লাল্লাতুর যাতে ভালই হয় তাই দেখুন। নইলে আমি কোথায়, বা আপনি কোথায়।

—কোয়ার যদি...

—কোয়ার কোনদিন শোধরাবে না। নইলে পত্রকারদের চটায় কেউ? যা করবার করো, কিন্তু সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, যাতে সঙ্গে লোক থাকে। কিছু করার নেই। তবু, ওকে নিয়েই তো চলতে হবে।

—দেখব, দেখব। তবে শিকারখানার ব্যাপারটা বন্ধ করুক।

—কে বলতে যাবে?

এরকম নানারকম কথাবার্তার পরেই কোয়ার-এর ঘরে ধরমবীর সিংয়ের মেয়ে লাজবন্তীর বিয়ের প্রস্তাব আসে। কোয়ার পক্ষ থেকে সুজা সিং ও কৈলাস সিংয়ের কাছে প্রস্তাব যায় গোমতী ও বিপাশার বিয়ের।

লাজবন্তী ও তার জননীর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও ধরমবীর সিং বলে, এ বিয়ে হবে। জনমকুণ্ডলী বলছে রাজযোটক হবে। বলছে মেয়ের সুখ হবে। আর বাড়ির বড়রা সবাই একমত যে এখানে বিয়ে হলে ভাল।

লাজবন্তী ভাসে, চোখের জলে ভাসে। লারাতু মানে নির্বাসনে যাওয়া। লারাতু মহলে যে ঢুকেছে বউ হয়ে, সে আর বেরোতে পারে নি কোথাও। এখন তার মনে পড়ে প্রপিতামহী বলত, মেয়ে হলে অনেক ঘরে শিশুকন্যাকে মেরে ফেলত। মাকে বলে, এর চেয়ে মেরে ফেলনি কেন?

মা মেয়ের গায়ে হাত বোলাতে থাকেন। সংসারে কোন কাজ তো তাঁর সিদ্ধান্তে চলে না। তিনি বলেন, বাবা সবদিক বিচার করে বিয়ে দিচ্ছে, ভাল তোর হবেই।

গোমতী ও বিপাশার মায়ের সব মিনতিও কোয়ার সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করেন। গোমতী ও বিপাশা বড় হবার পর বাপের সঙ্গে বছরে ক'দিন কথা বলেছে তা ভাববার কথা। আর, যদিও রাজপুতদের পালামৌ প্রবেশ একদা অতীতে, যখন রেলপথ ছিল না, বুনোহাতি, জঙ্গল ও কালো কালো মানুষ ছাড়া কিছুই বলতে গেলে ছিল না, তবু লারাতু

এখনো বিক্রম সংবতে নির্বাসিত। চালচলনও পুরনো যুগের। প্রাচীন রাজবংশের প্রথানুসারে ছেলেও অন্দরমহলে কমই আসে। ভাইবোন-বা মা-ছেলে, বা বাপ-মেয়ে কোন সহজ ঘরোয়া সম্পর্ক নেই। কৌয়ার এখনো প্রাচীনপন্থী।

মেয়েরা মায়ের কাছেই কাঁদল।

মা স্বামীকে বললেন, আপনি ওদের এখনি বিয়ে দেবেন তো আমার ভাইদের বলুন। তাঁরা টাউনে কোনো অফসর ছেলে দেখবেন।

—কেন?

—মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ নেই একটা?

—মেয়েদের পছন্দ! মেয়েদের পছন্দ হবে না কেন? মৈনপুরে আর কিষাণপুরে দেওয়ালির সময়ে সিনেমা যায়, বাড়িতে মোটরগাড়িও আছে।

—ছেলেরা তো জমিদারী দেখে শুধু।

—খুব ভাল কাজ করে।

—কৈলাস সিং তার প্রথম বউকে মেরে ফেলেছিল। শুনে আপনার ভয় করে না?

—সে সাহেবের সামনে বেরিয়েছিল, সাহেব তার ফটো তুলেছিল, কাগজে ছেপেছিল, তাতে কলঙ্ক রটে গিয়েছিল। কোন রাজপুত চাইবে তার বউয়ের ফটো সবাই দেখুক?

—আপনি আমার কোনো কথাই শুনবেন না?

—না, কৌয়ার বংশ মেয়েদের কথায় চলে না।।

—মেয়েদের তো দেখতেও পাব না আর।

—সে তাদের দয়া হলে দেখতে দেবে। তবে বিয়ের পর মেয়ের বিষয়ে বাপের বাড়ির কোন কথা না বলাই ভাল।

—আমার ভাইরা তো···

—বউদের নিয়ে ঘুরছে, সাইকেলে চেপে পড়াতে যাচ্ছে, তাদের চালচলতির কথা তুলো না।

—গোমতীদের আঠারো বছর বয়সও হয়নি।

—ষোল আর চৌদ্দ ! আর কথা বাড়িও না।

—না, আর বলব না।

একই সঙ্গে পর পর বিয়ে হবে। ছেলের বিয়ে হবে, বউ আসবে। তারপর মেয়েদের বিয়ে হবে, মেয়েরা চলে যাবে। বাড়ি চুনকাম, রং-পালিশ হল। আত্মীয় সমাগমে বাড়ি ভরে গেল। কৌয়ার বললেন, এমন ধুমধাম করো, মানুষ যেন মনে রাখে।

ধানবাদ থেকে বাজনার পার্টি এল, টাউনের কমিশনার, পুলিশ-সাহেব থেকে সব বড় বড় অফিসার নিমন্ত্রণ পেলেন। মোটরগাড়ি ভাড়া করা হল টাটা থেকে। আলোকসজ্জা, বাজি পোড়ানো, বাদ গেল না কিছু। ঝুঝার, নাড়া, কোকার, গাইবানী, চৈতপুর, মাকাপুরা, বড়াটোলি থেকে প্রজা ও কামিয়ারা এসে রান্নার কাঠ জোগান দিল, উৎসব প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করল, মাথা পিছু এক টাকা করে সম্মানী দিয়ে গেল আর চিড়ে ও গমের লাড্ডু নিয়ে গেল কোঁচড়ে বেঁধে।

গোমতী ও বিপাশা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি গেল, লাজবন্তী কাঁদতে কাঁদতে এল শ্বশুরবাড়ি। রাজপুত বিরাদরি বলাবলি করল, এটা আমাদের মিলনযজ্ঞ হল বটে একটা।

কালেক্টর কৌয়ারকে বললেন, রাস্তাঘাটের বিরোধী ছিলেন, দেখছেন তো লারাতু আসা কত সহজ হয়ে গেছে।

কৌয়ার বললেন, হ্যাঁ, তা হয়েছে।

—ছেলেকে আই. এ. এস পড়ান না ?

—ওর সিংহ রাশি, এমনিতেই ওপরে উঠবে।

ভকিল ও তশীলদার পরস্পরকে অভিনন্দন জানাল। তিনটি প্রতাপশালী রাজপুত পরিবারকে লারাতুর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে বাঁধতে তাদের কম কসরত করতে হয়নি।

কৌয়ার বললেন, ধরমবীরজী, বিয়ের কথা "ধরমজ্যোতি" কাগজে খুব বড় করে লিখবেন তো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব বড় করে লিখব বই কি। দিনকাল পালটে যাচ্ছে,

ভগবান যদি প্রসন্ন থাকেন, তাহলে "ধরমজ্যোতি" নিয়ে যাব পাটনা। এখন কাগজ হাতে আছে তো হাতিয়ার হাতে আছে।

—তাই করুন, তাই করুন।

—মনে জানবেন, মন্দ গ্রহ কেটে যাচ্ছে, এখন অনেক বছর আপনার সময় সুপ্রসন্ন যাবে।

গলা নামিয়ে ধরমবীর সিং বললেন, চলুন, একটু বেড়াই।

আলোকোজ্জ্বল মহলের সামনে বাগান, তারপর ডানদিকে তাকালেই দেখা যায় গভীর আঁধার জঙ্গলের শুরু।

সেদিকে চেয়ে ধরমবীর সিং বললেন, কুনারী ভুঁইন আর তার বাচ্চা তো ওখানেই মরেছিল ?

—ধরমবীরজী !

—আপনার হাত ধরে বলছি, আমার কথাটা শুনুন। লাজবন্তীর বিয়ের আগে আমি খুব বড় তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আর এ কথা প্রাচীনরাও বলে গেছেন, যে ছোটজাতের রক্তদান করলে ভূমি প্রসন্না হন। লারাতুর মাটি সে জন্যই এখন খুব সুলক্ষণা। এ কথা জেনে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি !

—বুঝান সে কথা এসব সরকারী অফসরকে !

—এরা কি জানে বলুন ?

—চলুন ভিতরে যাই।

—কি সুন্দর দেখাচ্ছে মহল !

—আপনার মেয়েকে কেমন দেখাচ্ছে ?

—লছমী দেবী যেমন !

—ওই সাতলহরীর সাতটা লকেটই খাঁটি বাদশাহী মোহর, বংশের পুরনো জিনিস।

—আপনার ঘরেই তো থাকবে।

—মেয়ের জন্যে ভাববেন না।

—সে ভাবনা তো আপনার এখন। তবে লাজবন্তী খুব সুশীল, শান্ত মেয়ে।

—নাতি চাই আমি, কৌয়ার বংশ রক্ষা করবে।

—আমিও তো দৌহিত্র চাই।

আকাশ উদ্ভাসিত করে বাজি পোড়ে, আলোর ফোয়ারা ওঠে।

কৌয়ারের মন উল্লাসে ভরে যায়। ছোট জাতের রক্ত পেলে ভূমি সুপ্রসন্না হন? কৌয়ারের দিন আসুক, পালামৌয়ের মাটিকে তিনি অন্ত্যজ রক্ত অর্ঘ্যে চিরপ্রসন্না রাখবেন।

॥ ছয় ॥

আজ বিশ বছর বাদে সব মনে পড়ছে কৌয়ারের। এখন আর তিনি পারতপক্ষে অন্দরে যান না। কৌয়ারিন দেববিগ্রহ স্থাপনা করে ঠাকুর ঘরেই আশ্রয় নিয়েছেন। কথাও বলেন না। দিনে একবার অন্ন গ্রহণ করেন, ঠাকুর ঘরের সংলগ্ন ঘরে তাঁর ভূমি শয্যা।

কৌয়ার যখন বিগ্রহ প্রণাম করতে আসেন কৌয়ারিনের শীর্ণ মুখ ও নীরব দৃষ্টি তাঁকে যেন তিরস্কার করতে থাকে।

কৌয়ার শুনেছেন, বৈদ্যের বা ডাক্তারের ওষুধ কৌয়ারিন খান না। লাজবন্তীর হাতে চাবির গোছা তুলে দিয়ে কৌয়ারিন নিজেই নিজেকে ছুটি দিয়েছেন। কয়েক বছর ধরেই স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন না, ছেলের সঙ্গেও পারতপক্ষে নয়। লাজবন্তী অবশ্য শাশুড়ীর সেবা করে।

এটাও আশ্চর্য যে পৌত্র-পৌত্রীকেও কাছে ডাকেন না কৌয়ারিন। যেতে চান না পিত্রালয়ে।

কৌয়ার বোঝেন সবই, আমল দেন না।

কি করতে পারেন তিনি। ষোল বছরে বিয়ে হয়ে আঠারো বছরে যমজ ছেলের জন্ম দিয়ে গোমতী যদি মরে যায়? সে ছেলেরা বেঁচেছে, বড় হয়েছে। গোমতীর বর আবার বিয়ে করেছে। সে কি ঘর শূন্য রেখে দেবে? সন্তান হতে গিয়ে মৃত্যু। এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু কৌয়ারিনের বিশ্বাস, গোমতীকে হাসপাতালে দিলে সে বাঁচত।

শ্বশুরবাড়ি থেকে যে ব্যবস্থা করবে তাই তো হবে। তা কৌয়ারিন বোঝেন না।

বিপাশার শ্বশুর তাকে আসতে দেন না। তাঁদের বংশে যা নিয়ম, তাই তো হবে।

আর বিপাশার স্বামী তার উপপত্নীর সঙ্গেই বাস করে। সেও তো বিপাশার ভাগ্য। ভাগ্যকে কে এড়াতে পারে?

লাজবন্তীকে নিয়েই কৌয়ারিনের সুখী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটাও ঘটনা, যে অমরজিৎ তার স্ত্রীর মোটামুটি অনুগত।

আর অমরজিৎ তাঁর খুব একটা বাধ্য ছেলে নয়। কৌয়ার যা যা ভালবাসেন তা অমরজিতের পছন্দ নয়।

সে ট্র্যাক্টরে চাষ করাতে চায়।

সে বাড়ির প্রাচীন জিনিসপত্র বেচেছে, আরো বেচে দিতে চায়।

সে ছেলেদের রাঁচিতে হস্টেলে রেখে পড়িয়েছে। বড় ছেলে নাকি ইঞ্জিনিয়ার হবে। ছোট ছেলে হবে পুলিশ অফিসার। লাজবন্তী অমরজিৎকে বুঝিয়ে ছেড়েছে যে আজকাল এডুকেশান ছাড়া কিছুই হবার নয়।

ওরা মোটরে চেপে টাউনে সিনেমা দেখতে যায়। ওদের রহনসহন, চালচলন আলাদা।

অমরজিতের, কৌয়ারের মত নারীমাংসের, মানুষ শিকারের ক্ষুধা অত প্রবল নয়।

কিন্তু টাকার ক্ষুধা খুবই প্রবল।

অমরজিৎ কেন, রাজপুত বিরাদরির পরবর্তী প্রজন্মই যেন বিক্রমসংবতে থাকতে নারাজ।

কৌয়ার ভালই জানেন, যে অমরজিৎ এই দুর্গ-প্রাসাদের মত স্থবির বাড়ি রাখবে না। মাকে ও বলেই রেখেছে, মডার্ন বাড়ি বানাব। সিনেমায় যেমন দেখি।

সিনেমার ওপর অমরজিৎ ও তার বউয়ের অত্যধিক আকর্ষণ। সিনেমা এমন কি জিনিস? সিনেমাতে নতুন কি আছে? রাঁচিতে মাঝে মাঝে যান কৌয়ার আজকাল। সেখানে যে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার ডাক্তার হিসেবে পসার জমাতে না পেরে ভেষজ ওষুধ বিশ্বাসী বৈদ্যাচার্য হয়েছেন, তাঁর কাছে যান। রাঁচিতে অনেক সিনেমাই দেখেছেন।

অমরজিৎকে বলেছেন, সিনেমায় কি দেখায়? যত ঠাকোর রাজপুতদের নিন্দে! তারা জুলুম করছে, গ্রাম জ্বালাচ্ছে, মানুষ মারছে, এ তো হয়েই থাকে। এ সব দেখাবার কি কারণ আছে?

—সিনেমা সবই কি একরকম? রকম রকম কহানী নিয়ে সিনেমা হয় বাবা!

—সিনেমা আর অখবর! অখবর খোলো, হরিজন নির্যাতন, ছোট জাতকে ভোট দিতে দিল না! আর কি কোনো খবর নেই দেশে?

—ও সব পলিটিস, বাবা!

—দেখ অমরজিৎ! তোমার সব কিছুর মূলে এই জমি! জমি ধরে রাখতে গেলে আমার পথে চলতে হবে। সময়ও এখন খুব খারাপ, মনে রেখো।

—সময় খারাপ কেন বলছেন?

—তোমাকে কি বোঝাব বলো তো?

কৌয়ারের রক্ত তখনি ক্ষুধার্ত হয় যখন সময় খুব খারাপ। আর তখনি তিনি সেই স্বপ্নটা দেখেন। কুনারী ভুঁইনকে তিনি তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। কুনারী হরিণীর মত দৌড়চ্ছে। এসব কথা অমরজিৎকে বোঝানো যাবে না।

সময় খারাপ তো বটেই, নইলে কে ভেবেছিল উনিশশো আশি সাল শেষ হতে না হতে পালামৌয়ের মাটিতে এমন করে জমে উঠবে বিদ্রোহ? ভাবতে গেলেও লাবাতুর কৌয়ারের রক্তে আগুন লেগে যায়, দাবানল।

বিশ বছর আগে যখন কৌয়ারমহল বিয়ের উৎসবে আলোক দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন তো কিছু জিনিস ভাবতে পারে নি কৌয়ার এবং রাজপুত ও ব্রাহ্মণ মালিক-জমিদাররা, গ্রামে গ্রামে জমিমালিক মহাজনেরা।

ভারত সরকার কামিয়৷ৌতি প্রথাই বন্ধ করে দেয়। শুধু যে বন্ধ করে তাই নয়, ডেপুটি কমিশনার খুব ধুমধাম করে সেমারা গ্রামে একশোর ওপর কামিয়াকে মুক্ত করে দিল। বাস্তবে এ আইন কার্যকরী

হয়নি। কেন না দাসপ্রথা উচ্ছেদ হতে পারে কি ভাবে, মাটি যখন অফলা, মানুষ যখন নিরন্ন, মালিকের জমিতে খাটা ছাড়া যখন মানুষগুলির জাতি নেই?

না, দাসও ছিল, মালিকও ছিল। কিন্তু ভারত সরকার যে আইন প্রণয়ন করল, এটাই তো গালে চড় মেরে গেল কৌয়ারদের।

ভারত সরকারের রিসার্চ টীম আসতে থাকল, আসতেই থাকল পালামৌতে। আর দাসপ্রথার অজানিত সব অন্ধকার ইতিহাস লেখা হতে থাকল।

এটা সেদিন ভাবা যায় নি যেদিন আলো জ্বলেছিল, বাজি পুড়েছিল, ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়েছিল, "মেরা তন্ ডোলে মেরা মন ডোলে" আর "ইয়ে জিন্দগী উসি কি হ্যায়" সিনেমা গীতের সুর।

ভাবা যায় নি কামিয়ারা নিজেরা নিজেদের সমিতি গড়বে। ভাবা যায় নি, শিবাজী ময়দানে গান্ধী হলে পালামৌয়ের দাসমজুররা এক বিরাট জমায়েত করবে। ডালটনগঞ্জ শহরের বুক দিয়ে কয়েক হাজার দাস ব্যানার ধরে স্লোগান দিতে দিতে হেঁটে যাবে, ঘেরাও করবে ডেপুটি কমিশনারকে।

ধরমবীর সিং নিশ্বাস ফেলে কৌয়ারকে বলেছিলেন, বাইরের বিষাক্ত বাতাস ঢুকে পড়েছে পালামৌয়ে। আর কিছুই আগেকার মত থাকবে না দেখবেন।

অনল তলোয়ার লিখেছিল, পালামৌয়ের মাটির নিচে অসহনীয় তাপ অনেকদিন ধরে জমছে আর জমছে। এই দাসদের প্রতিবাদ, "কামিয়ৌতি বন্ধ্ করো. কামিয়ৌতি নেহি চলেগা" সেই মাটির উত্তাপের সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমরা তাকিয়ে আছি কবে আগুন জ্বলবে।

ভারত সরকার তো আবারও দুশমনি করেছিল।

ডালটনগঞ্জের বুক দিয়ে যে ট্রেন যায়, সে ট্রেন পাঞ্জাব অবধি খুলে গেল।

কৈলাস সিং মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসে বলল, এখন সুবিধা হয়ে গেল খুব। তীর্থযাত্রাও করা যাবে।

কৈলাস সিং কয়েক বছর বাদে বাদে তীর্থভ্রমণে যায়। এভাবে সে পুণ্য অর্জন করেই বেড়াচ্ছে, এবং এখনো তাকে পুণ্য অর্জন করতে হবে। তার গোহাল যত বড়, গোসম্পদ তার যেমন বিখ্যাত, তেমনি বিখ্যাত তার বাড়ির রক্ষক নাগদেবতা বা একটি প্রাচীন শঙ্খচূড়। সে তার সময়ে বেরোয়, অন্য সাপ ধরে খায় ও ফিরে এসে তার ফাটলে ঢুকে যায়। নাগও দেবতা, গরুও দেবতা। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের কথা, এই নাগদেবতা সম্ভবত গরুর আন্দোলিত লেজকে ভোজ্য সাপ মনে করে খাবার জন্য হাঁ করেন ও লেজকে সর্পভ্রমে খেতে যান। ভ্রান্তি অপনোদনের পর ক্রোধে গরুটিকে দংশন করেন। এমনটা কয়েকবার ঘটল। সাপও চাই, গরুও চাই, কিন্তু এভাবে গৌমাতা নিধনে নাগদেবতার নয়, মালিকের পাপ। এজন্যই কৈলাস সিং তীর্থভ্রমণ করে। গোহালটি দূরে সরিয়েও লাভ হয় নি। বার্ধক্যেও নাগদেবতা খুবই সচল ও সর্বত্রগামী।

কৈলাসের কথা শুনে ধরমবীর বলে, সত্যনাশ হয়ে যাবে এখন।

—কৈসে?

—কামিয়া লোকদের ভাগিয়ে নিয়ে যাবে লেবর ঠিকাদার। ওরা পালাতে থাকবে।

এমনও তো ঘটল। দু'চার ঘর করে গ্রামকে গ্রাম থেকে মানুষ চলে যাতে থাকল।

রামাশ্রয় অমল তলোয়ারকে বলল, অকথ্য কষ্ট পাবে। খেতে পেলেও টাকা কমই পাবে। তবু থাক। পালামৌ ছাড়াও দেশে জায়গা আছে, গরিবকে শোষণের কত রীতি আছে, জেনে আসুক। চোখমুখ খুলবে খানিকটা। এখানে কি আছে? ছিল জঙ্গল। কাঠ এনে বেচত। ওরাই বলে, জঙ্গল ভি গিয়া, হমলোক ভি গিয়া।

—এখন আর কৌয়ার জেনে যাবে বলে ভয় কর না।

—কি ভয় করব? তবে এ ভাবে পালামৌয়ে মুক্তি আসবে না, কিন্তু পথ দেখাবে কেউ। কৌয়ার জানবে? কি জানবে? রামাশ্রয়, একটি লোক, কামিয়া বিশাল ভুঁইয়াকে বাড়িতে রেখেছিল, কামিয়ৌতি

উঠে যাক বলে তার মস্ত স্বপ্ন ছিল। আর ভারতসরকারের আইনকে সে স্বাগত জানিয়েছিল....স্বাগত···জানিয়েছিল···

—দাদা! তুমি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছ।

—ইমোশান নয় অনল, ক্রোধ, অক্ষম ক্রোধ। আইন করে কিছু হয় না, কেন না আইন করে···

—কামিয়ৌতি বন্ধ করা যায় না? ভারত সরকারও তা চায় না। বন্ধ হলে এইসব মালিক-মহাজন! লারাতুর কৌয়ার তো একা নয়? গ্রামে গ্রাম দশ-বিশ-পঞ্চাশ বিঘার মালিকও ছোটখাট কৌয়ার একেক-জন। সবাই মানুষ-খেকো।

—সহি বাত।

—দাদা! আইন কার্যকরী করলে কায়েমি স্বার্থ চোট খায়। কায়েমি স্বার্থকে কোন সরকার চোট দেবে না, দিলে সরকারের খুঁটি নড়ে যাবে।

—এর জন্যেই···

—আন্দোলন চাই, আন্দোলন। সে আন্দোলন···

—কামিয়া দাসদের এ চৌপালকে ছোট কোর না অনল। ওরা সাহস দেখিয়েছে, এগিয়ে এসেছে।

—অন্য আন্দোলন চাই। বিহারে আন্দোলন তো চলছে। ভোজপুর আর অন্যত্র কৃষিক্ষেত্রে চলছে নকশাল আন্দোলন, সিংভূমে রাঁচিতে চলছে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন।

—পালামৌতে আন্দোলন আসবে কবে? যে আন্দোলন পালা-মৌয়ের মাটিকে কথা বলাবে?

—নিশ্চয় আসবে।

—তুমি ঠিক বলেছ। লারাতুর কৌয়ার একা নয়, অনেক। এরা রক্তবীজের মতো।

অনল তলোয়ার বলেছিল, মানুষকে তৈরি থাকতে হবে। আন্দোলন দমন করার সময়ে প্রশাসন, পুলিশ, সব থাকবে মালিকদের পক্ষে।

—ওহি তো পলিটিস্।

—আর হিন্দীভাষী এলাকার পলিটিস তো জাতপাতেরও বটে। বর্ণহিন্দু যত, সব পুলিশে-প্রশাসনে। তারা জাতপাত দেখে। মালিকের সঙ্গে থাকলে তার জাতিস্বার্থ আছে, শ্রেণীস্বার্থ আছে। শেষ অবধি তো এটা শ্রেণীযুদ্ধ।

—কবে আসবে আন্দোলন?

—আসবে, আসছে।

—আসুক। আমি আর কিছু পারব না, দেখে তো যাব। সেটাই অনেক।

॥ সাত ॥

এসেছিল, এসে পৌঁছেছিল আন্দোলন। কৌয়াররা ভাবেন নি, সত্তরের শেষ ও আশির দশক পালামৌয়ের মাটিকে এমন চমকিত করবে।

রামাশ্রয় বলেছিল, সে পালামৌ জেলাকে ভারতের ম্যাপে তুলে দিতে চায়। রামাশ্রয় তার সাধ্যমত যেটুকু পারে করেছিল। বেশ কয়েক বছর ও দিল্লীর টীমগুলির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রামে দাসপ্রথার নগ্ন চেহারা দেখায়। যে যখন এসেছে, ওর বাড়িতেই থেকেছে। সীতা স্কুলশিক্ষিকা, তেজী মেয়ে। স্বামীর সব কাজে ও সহকর্মিনী। ছেলে-মেয়েদের ভার, সংসার চালানো, সব ওই করেছে। রামাশ্রয়ের প্রেস বার বার মার খেয়েছে, মালিকের অবহেলার জন্যে।

এ সবই অনল তলোয়ার জানত। সে বলেছিল, দেখবেন, আন্দোলন আসবে পালামৌয়ে।

রামাশ্রয় ক্ষেতজমিনে কামিয়ৌতি বা দাসপ্রথা দেখেছিল। পালামৌ জেলায় লেবার ঠিকাদারদের দালাল ঢুকে পড়ে রেলপথ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয়বার যখন পালামৌয়ে দাসমজুরদের বড় সম্মেলন হয়, সেখানে পুলিশ নিয়ে এল সাতটি শিশুকে। লেবার-দালাল যাদের "পেট ভরে খেতে পাবি" এই লোভ দেখিয়েই নিয়ে গিয়েছিল মির্জাপুর গালিচা

কারখানায়। সাত থেকে দশ বছরের এই শিশুদের উদ্ধার করে পুলিশ। প্রতি শিশুর গায়ে গালিচা কারখানা মালিক লোহার শিক পুড়িয়ে দাগ মেরে দিয়েছিল।

এ সম্মেলনে প্রেস উপস্থিত ছিল। ফলে পালামৌয়ে দাসপ্রথা চলে, তাই শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় চলে যায় কসাইখানায়, এসব খবর খুব ফলাও করে ছাপা হয়।

কৌয়াররা এসব দেখে যাচ্ছিল।

ধরমবীর সিং পুলিশ সুপারকে বলল, কি দরকার ছিল ওদের ফিরিয়ে আনবার? সব কামিয়া ঘরের ছেলে। আবার আমাদের বিষয়ে লেখা বেরোচ্ছে, আমরাই তো কামিয়া রাখি।

পুলিশ সুপার উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। বললেন, এ তো সাতটা ছেলে। হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে জেলা থেকে, পুলিশ কিছু করছে?

—কেন করছে না? বাইরে চলে গেলে আমাদের ক্ষেতীজমিন সামলাবে কে?

—পুলিশ, বিহারের পুলিশ খুবই খতরনাক। মাঝে মাঝে দেখাতে হয়, পুলিশ মানুষের জন্য ভাবে।

—কৌয়ার ঠিকই বলেন, যে গরমেণ্টের যত ভাবনা সব আদিবাসী আর ছোটজাতের জন্যে। আমরা চাইলে কেন মদত পাই না!

—বড্ড ভুলে যান। কুনারী ভূঁইন হত্যার পর কৌয়ারকে পুলিশ কোন হেনস্তা করেছিল?

—তা করে নি।

—কম কামিয়া মেরেছেন ঠাকোররা? কম গরিব মেয়ের ইজ্জত লুটেন? পুলিশ কোন্ নালিশটা শুনে কাজ করে?

—নালিশ করছে ওরা?

—নালিশ করার লোক জুটে যাচ্ছে। ওরাও এখন থানায় আসে।

—আপনি কি বলছেন?

—শুনতে তো পাচ্ছেন। দেখুন, পুলিশী মদত আপনারা পাবেন।

কেন পাবেন, কিভাবে পাবেন, কবে থেকে পাবেন, তা আপনারা এখনো জানেন না। আমি জানি। সময় এলে আপনারাও জানবেন।

—কিছু ঘটতে চলেছে? কৌয়ার কিছু করেছেন?

সব সময়ে কৌয়ারদের হাতেই সব তুরুপের তাস থাকবে তা নাও হতে পারে। আচ্ছা, আপনি আসুন।

এসব কথাবার্তার কিছুকাল বাদেই ঘটে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সরকারী যেসব প্রকল্প ধনীকে ধনী করে ও গরিবকে মারে, তার মধ্যে সবচেয়ে স্বর্ণসম্ভবা হল নদী-বাঁধ প্রকল্প।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালেই খড়ি-বাঁধ প্রকল্প রচিত হয়। বাঁধ তৈরি মানেই আদিবাসীদের গ্রাম ও চাষের জমি ডুবিয়ে দেওয়া।

খড়ি-বাঁধ প্রকল্পের জন্যও ত্রিশটি আদিবাসী গ্রাম মৃত্যুদণ্ড পায়। চেরো ও খারোয়ার আদিবাসীরা একদা পালামৌয়ে রাজা ছিল। তারা কৃষক, সাবারা নদীর জল তাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অনল তলোয়ার ও অর্জুন সহায় সাবারা ও গেরোয়া গ্রামের মাঝামাঝি ও অঞ্চলের একমাত্র প্রাথমিক স্কুলে মাস্টার হয়ে ঢোকে।

দুজনেরই তখন একটা কোন শক্তিশালী নামের আড়াল দরকার। অনল তলোয়ারের আসল নাম কিশোর রাম, সে সত্যই হরিজন। কিশোর রাম ডাসটনগঞ্জে শক্তিশালী গান্ধী হরিজন মিশনের সাহায্যে সাবারার স্কুলে নিযুক্ত হয়।

কিছুদিনেই ওরা জনজীবনে যথেষ্ট মিশে যায়, এবং হাটে চোঙা নিয়ে রঘুবর খারোয়ারকে বক্তৃতা করতে শুনে জানে, যে গ্রামবাসীদের কাছে সবচেয়ে জরুরি এখন, তিরিশটি গ্রামের মানুষদের অস্তিত্বের সংকট। রঘুবর খারোয়ার গভীর বিপন্নতায় বলে, আমি কোয়েল-কারোর কথা জানি, খড়কাই বাঁধের কথা জানি, সুবর্ণরেখা প্রকল্পের কথা জানি।

কেন দিকে দিকে আদিবাসীরা বড় বড় বাঁধ প্রকল্পে বাধা দিচ্ছে?

কেন না সরকার আমাদের সঙ্গে তামাশা করে, সরকারের সব কথাই ধাপ্পা!

খড়ি-বাঁধ প্রকল্প থেকে সেচ পাবে কারা? কোন আদিবাসী? কাদের জমি আছে? চেরো আর খারোয়াররা সবচেয়ে চাষীবাসী আদিবাসী। তাদের তো উচ্ছেদ করে দিচ্ছে।

জমির বদলে জমি দেবে সরকার?

দেবে না, দেবে না।

জমির বদলে টাকা দেবে বলছে?

সে টাকা আমরা কার কাছে আদায় করতে যাব, আমরা সরকারের সঙ্গে লড়তে জানি না।

অনল তলোয়ার ও অর্জুন সহায়, "খড়ি-বাঁধ আদিবাসী প্রতিবাদ মঞ্চ" গড়ে উঠেছে জেনে অবাক হয়।

রঘুবর বলে, কৈসে না হোই? আমাদের ঘর চলে যাবে। জমি চলে যাবে।

মাটিতে থুথু ফেলে বলে, পাঁচ বছর ধরে দৌড়াচ্ছি সেচবিভাগে, কমিশনারের কাছে, কিছুই হচ্ছে না।

অর্জুন সহায় বলে, সরকার কত টাকা দেবে বলছে?

—আমার কাছে লেখা আছে।

—সব নিয়ে স্কুলে এসো রাতে।

রঘুবর নিজেকেই বলে, যাব। সব চেষ্টাই করছি যখন, তখন আপত্তি কি?

—লড়াই করতে হবে রঘুবর।

—ভাই! লড়াই করে খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষের নেতা গঙ্গারাম খুন হয়ে যায়। আমি অনেকদিন মুখিয়া ছিলাম, মানুষ আমাকে মানে। আমি এমন লড়াই করব না যাতে আমার ভাই বোনের উপর গুলি চলে।

—না না, এটা আইনের পথে লড়তে হবে। আর, লড়াই তো সরকারের সঙ্গে হবে। তোমরা চলে যেতে রাজী আছ, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এই তো।

এ ভাবেই খড়ি-বাঁধ প্রকল্পের ব্যাপারে আদিবাসীরা লড়তে শুরু

করে। অর্জুন সহায়ের জনসংযোগ কতটা, তা অনল ভলোয়ারও জানত না। পাটনায় তার চেনাজানা, দিল্লীতে যোগাযোগ, ক্ষতিপূরণের মামলা অনেকদূর গিয়েছিল।

কৌয়াররা অত্যন্ত হকচকিয়ে যায়, যেদিন জানা যায় তিরিশটি গ্রামের সাতশো উনিশটি পরিবারই নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, তারপরও ঘর ও জমি ছাড়ে নি, জমি কিনে তবে দু'চার ঘর করে গ্রাম ছাড়ছে।

রামাশ্রয় অনলদের বলল, বাধাই! হাজারবার বাধাই।

অর্জুন ঈষৎ হেসে বলল, এরপর ওরা বসে যাবে না, একের পর এক আন্দোলনে সামিল হবে।

—বহোত খুব! পালামৌ তো পথ দেখাল।

—হ্যাঁ···ভারতে কোথাও কোন প্রকল্পের কাজ করতে গেলেই আদিবাসীর জমিভূমি গ্রাস করা হয়। আজ অবধি আদিবাসী কোনো সুবিচার পায়নি। এই প্রথম তা ঘটল। আর তা ঘটল পালামৌয়ে।

রাজপুত বিরাদরিতে এ কথা আলোচনা হল বাঙ্কা এস্টেট থেকে নির্বাচিত এমেলে বরুণ সিং আহূত এক সভায়।

কৌয়ার বললেন, লড়বার সাহস ওরা পেল কোথা থেকে? ওদের বুদ্ধি জোগাল কে?

কৈলাস সিং বললেন, ওরা কি কম চালু? চেরো আর খারোয়াররা কয়েক বছর ধরেই তো টাউনে আসছিল আর যাচ্ছিল।

বরুণ সিং উপনির্বাচনে জিতে খুবই প্রফুল্ল। এই সেচ প্রকল্প থেকে তার তিন হাজার একর জমির অনেকটা সেচ পাবে।

সে বলল, ছেড়ে দিন ওদের কথা! টাকা পেল! কত টাকা পেয়েছে? জমি কিনবে! মালিকরা ওদের চড়া দামে রুখাশুখা জমি বেচে টাকা হাতিয়ে নেবে। দালাল তো লেগে গেছে। আর জংলী ভূতগুলো টাকা উড়াচ্ছে কিসে জানেন? প্ল্যাস্টিকের টেবিলভ্যানে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামা কাপড়ে, হাবিজাবিতে।

ধরমবীর সিং বললেন, কথা তো সেটা নয়। কথা হল, এতে ওদের সাহস বেড়ে গেল। এর ফল ভাল হবে না, হতে পারে না।

—ওরা গেল কোথায়?

—যে যেখানে পারছে, চলে যাচ্ছে।

—কে জানে কি শুরু হল পালামৌয়ে।

এস. পি. বললেন, আপনাদের চিন্তিত হবার মত কিছু হয় নি।

ধরমবীর সিং বললেন, আপনি এ কি বলছেন?

—ঠিকই বলছি।

বিরাদরির সদস্যরা এ-ওর দিকে তাকাল। এস. পি. রাজপুত বটে, তবে বিহারের নয়। উত্তরপ্রদেশের ঠাকোর। উত্তরপ্রদেশের ঠাকোররা বিহারেব ঠাকোরদের জংলী-জানোয়ার মনে করে, ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানে। এই পুলিশ সুপার কৌয়ারদের উদ্বেগের গভীরতা বুঝবে কি করে?

॥ আট ॥

অবশ্য কার্যকালে পুলিশ সুপার কৌয়ারদের খুবই মদত দেয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে পালামৌয়ে ঘটে যায় বিপর্যয়। অন্য কোন জাতি নয়, রাজপুত ছেলে বিন্দা সিংয়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ক্রান্তি ফৌজ। রাজপুত-ব্রাহ্মণ মালিক জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এমন খোলাখুলি আহ্বান এ অবধি পালামৌয়ে কেউ জানায়নি।

সে সময়েই দেখা গেল থানা থেকে থানা গ্রামবাসীরা জমিদারদের লোকদের ভাসিয়ে দিচ্ছে।

"গয়ের মজুরোয়া" জমি। যে জমি সরকারের, বনবিভাগের, যে জমি থেকে ঘাস, পাতা সবাই নিতে পারে, যে জমির বিড়িপাতা, বা মহুয়া, বা পলাশগাছের লাক্ষা সংগ্রহ করতে পারে সবাই, সে জন্য জমিদারের লোককে এক পয়সাও দেব না।

চাষের সময়ে মাঠে কাজ করব না চার টাকা মজুরি বা সামান্য ধানের বিনিময়ে।

সরকার মজুরি বেঁধে দিয়েছে, সেই মজুরি দাও। এই সব ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য গঠন করো "শোষিত মুক্তি দল।" যোগ দাও

দলে দলে। "শোষিত মুক্তি দল"-এর কথা ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ-সুপার জানান ডি. আই. জিকে। এরকম অগ্নিগর্ভ প্রচার তো বিপজ্জনক।

ডি. আই জি. ঈষৎ হেসে বলেন, এখন জমিদাররা যদি তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সেনাদল গড়ে, তারাই ওদের মোকাবিলা করবে।

—অর্থাৎ রক্তপাত হবে।

—হতেই পারে।

—আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

—তখন পুলিশ অ্যাকশান নেবে।

—ধরবে কাকে?

—যারা আইন শৃঙ্খলা ভাঙবে, তাদের।

—বুঝলাম।

—বোঝেন নি। ব্লু প্রিন্ট তৈরি করুন। দেখুন বিন্দা সিং কে। আমি মনে করি নকশাল। ওরাই তো গরিবের পক্ষ নিয়ে লড়তে নামে।

—না না, পালামৌকে ভোজপুর হতে দেওয়া যাবে না।

—আই. জি-ও তাই বলেন।

বিন্দা সিংকে ঘিরে যখন পালামৌয়ের চামার, ধানুক, ধোবি, ডোম, কাহার, কান্দু, মাল্লা, কোয়েরি, ওরাওঁ, ভোগতা, চেরো, বিরজিয়া, খারোয়ারা সমবেত হচ্ছে, মিটিং করছে, সে সময়েই তারা নীলাম্বর ও পীতাম্বর ভোগতার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভুলে যাওয়া গান ফিরিয়ে আনতে থাকল।

তীব্র শীতে আগুন জ্বেলে বসে আবার তারা গাইল সে মহান সংগ্রামের গান।

ঔরঙ্গা নদীতীরে প্রাচীন পালামৌ কেল্লা তো গড়েছিল চেরো রাজারা। মহান চেরো রাজা মেদিনী সিং গয়া, হাজারিবাগ, সুরগুজা, ছোটনাগপুর জুড়ে রাজত্ব করেছিলেন।

তাঁর রাজসভা থেকে প্রতি প্রজাকে দেয়া হত গরু ও মোষ। ঘরে

ঘরে তৈরি হত মাখন ও ঘোল। তাঁর কথা মনে করো, মেদিনী রায়ের কথা।

চেরো আদিবাসীরা কতবার বিদ্রোহ করেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, মনে করো, মনে করো। নীলাম্বর ও পীতাম্বরের বিদ্রোহকালে পালামৌয়ের হাজার হাজার মানুষ তো হাতিয়ার তুলেছিল সাহেবদের তাড়াতে।

যাদের পূর্বপুরুষরা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীর অধিকার ছাড়ে নি, তাদের আজ এ অবস্থা কেন?

তোমরা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছ।

পান্না খারোয়ার বলেছিল, ধরো, প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? হাতিয়ার কোথায়?

বিরন বলেছিল, নীলাম্বর আর পীতাম্বর কি নিয়ে লড়েছিল? তলোয়ার নিয়ে। তলোয়ার আর বর্শা আর ধনুক নিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়া যায় না।

বিন্দা ঈষৎ হেসে বলেছিল, তবে বন্দুকই নেব আমরা।

—পাব কোথায়?

—পেতে হবে।

—বন্দুক কেনার পয়সা কোথায়?

—ভাই! গয়া জিলায়, রাঁচিতে, সব বন্দুক কেনে ডাকাতরা। অনেক পয়সা।

—আর চৈতপুরে অনেক লোহার।

বিরন ভোগতা বলল, ওরা পারবে?

বিন্দা সিং বলল, সব জায়গার লোহাররা পারছে, ওরা পারবে না কেন?

অনল বলল, মোয়ারের এস্টেট বটে, কিন্তু ঝুঝার ছাড়ালে জঙ্গলও আছে, মেদিনী রায়ের আমলের পাথরের কিল্লাও আছে। সেখানে প্র্যাকটিসও করা যাবে।

এমনি করেই গড়ে ওঠে শোষিত মুক্তি দল ও ক্রান্তি দল।

ভোগতা, চেরো, খারোয়ার মেয়েরা জঙ্গল থেকে কাঠ আনে, হাটে বেচে। কাঠের ঝুড়িতে লোহারদের তৈরি বন্দুক চলে গিয়েছিল গ্রামে গ্রামে, বিন্দা সিংয়ের লড়াইয়ের কালে।

মহুয়ার ঋতুতে কৌয়ারের লোকরা প্রথম বাধা পেল গ্রামের লোকদের কাছে।

সরকারী জঙ্গল থেকে মহুয়া কুড়িয়ে বস্তাবোঝাই করে ওরা জড়ো করেছিল। কৌয়ারের লোকরা প্রতিবার দু'চার টাকা বস্তায় মহুয়া কিনে নেয় পাইকারী হিসাবে। মহুয়ার ঋতুতে ওরাই মহুয়া কেনার ঠিকাদার।

পুরুষরা নয়, মেয়েরা রুখে দাঁড়াল এবার।

—জঙ্গলের মৌয়া কুড়াব, তোমাদের দেব না।

—বটে, কাকে দিবি ?

তেত্‌রি ভুঁইন পঞ্চাশ বছর বয়সেও খুব সমর্থ ও দজ্জাল আছে। ও হাত ঘুরিয়ে বলল, লালবদন সাউয়ের কাছে।

—কেন ?

—বোরা পিছু ও কত দিচ্ছে জানো ?

—পঞ্চাশ ? একশো ?

—পান্না খারোয়ার বলল, বিশ টাকা বস্তা। তোমরা দেবে, তো টাকা ফেল, নিয়ে যাও।

—জানিস আমরা কার লোক ?

—জানি না, জানতেও চাই না।

তেত্‌রি পান্নাকে বলল, তুই চুপ কর। এটা মেয়েদের মৌয়া, আমরা বুঝব। জঙ্গলের মৌয়া, সরকারী মৌয়া। আমরা দু'টাকায় মৌয়া বেচব না।

—তশীলদার সিং এলে বেচবি।

—হাঁ হাঁ, যা। ডেকে আন্ তাকে। তশীলদারকে কত দিস ? নিজেরা বেচিস লালবদনকে। এবার আমরাই বেচব। যা, ভাগ্।

তেত্‌রিয়া ওদের মারমুখো হয়ে তেড়ে গেল।

আর লালবদনকে পান্নারা বলে গেল, বিশ টাকা বস্তা কিনে নেবে। না নিলে কি হবে আমরা তো বলে গেছি।

—বিশ টাকা দিলে মরে যাব।

—কৌয়ারের লোকদের দাও কি করে?

—বহোত জুল্‌ম করতা।

—ঠিক আছে। আঠারো টাকা বস্তা কিনে নাও। মৌয়ার ভাও অনেক উঠে গেছে। আর, কৌয়ারের লোক জুলুম না করে, সেটা আমরা দেখব।

—তোমরা কারা, ডাকাত?

—না, শোষিত মুক্তিসেনা। ভেবে দেখ। ফরেসের পাশে বসে থাকো মৌয়ার সময়ে, তোমার চারপাশে আমরাই আছি, আর কেউ নেই।

লালবদন নিশ্বাস ফেলল। বলল, বেশ! এ মহুয়া বছর বছর আমিই নেব। পাঞ্জাবী ঠিকাদারটাকে দিও না। তবে মৌয়া নেব যেমন, বিড়িপাতাও নেব। কিন্তু তোমরা কারা?

—খেড়ি বাঁধের নাম শুনেছ?

—খুব শুনেছি।

—আমরা সরকারী জমিনে নয়াখেড়ি গ্রাম পত্তন করেছি।

—তোমরা কৌয়ারের কামিয়া নও?

—না। কামিয়া ছিলাম না, হবও না।

কৌয়ার এ সময়ে রাঁচিতে। বুন্দুতে সম্পত্তি কিনবেন, কিছুদিন থাকবেন না।

তশীলদার বলল, কারা মৌয়া বেচবে না?

—তেত্‌রি ভুঁইনকে চিনলাম। আর সব নতুন মুখ। চিনলাম না।

—আমি দেখছি।

তশীলদার লালবদনের কাছে গেল। লালবদন বলল, এরা লারাতুর প্রজা নয়।

—এরা কারা?

—খেড়ি-বাঁধ হয়ে যারা উচ্ছেদ হয়েছে, তারা। তারা নয়া খেড়ি বসত করেছে।

—বটে?

—সরকারী জমিনে।

—ওরা সরাসরি বেচে গেল?

—তাই তো এল। আর মালও খুব ভাল।

—আর আপনি কিনলেন?

—আমার তো ব্যবসা। ব্যবসায় এমনটা করতেই হয়। এই যে আপনি বেনামে কাঠচেরাই কল বসাচ্ছেন, সে তো আমিই করিয়ে দিচ্ছি। আপনি কৌয়ারকে মৌয়া দেখাবেন, তো আমি আপনার কল দেখাব।

—কা করে সাউজী! তিন পুরুষ ওর সেবা করে যাচ্ছি, না দিল কোনো তালুক, না একটা ট্রাক, আমাকে তো ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে হবে!

—আপনাদের জঙ্গলের মৌয়া তোলান!

—জঙ্গলটায়···যেন অভিশাপ লেগে গেছে···কেউ ঢুকতে চায় না, ভয় পায়।

—হ্যাঁ, সবাই বলে জঙ্গলে কুনারী ভূঁইন ঘোরে। আর জঙ্গলও বড় হয়ে গেছে, ঢুকলে ভয় লাগে। কিন্তু আপনাদের তো কামিয়া আছে।

—আজ থাকছে, কাল ভেগে যাচ্ছে।

—কাঠচেরাই কল যখন চলবে, ওই জঙ্গল থেকেই তো কাঠ পাবেন। কত পুরানা গাছ সব!

—লাভও আছে, তাই না?

—কাঠের কারবারে? অনেক লাভ। শহর ছড়াচ্ছে রাঁচিতে, সিংভূমে! কাঠের কারবারেই তো লাভ। দরজা, জানলা, আসবাব, এমন পাকা শাল, সিধা, মেহগনি পাবে কোথায়?

লালবদন ও তশীলদার পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। লালবদন আরো বলে, প্রাইভেট জঙ্গল কেউ রাখতেই পারে না। কৌয়ার ছাড়া কার বা জঙ্গল আছে?

—কেন, সরকারী ফরেস্?

—ওহি তো বুঝাতে চেষ্টা করছি আপনাকে, যে সরকারী জঙ্গলে যারা মৌয়া কুড়ায়, বিড়িপাতা তোলে, তাদের সকলের মালে ভাগ না বসালেও আমাদের চলে যাবে। আপনাদের তো জঙ্গল আছে।

তশীলদার হাসল।

—এটা পালামৌ। জমিদাররা সরকারকে পকেটে রাখে। যাকগে, কথা তো হয়েই গেল। আর জঙ্গলের মৌয়া বিড়িপাতায় নাফা কত! কৌয়ারকে ফৌজ রাখতে হয়, ঘোড়া রাখতে হয়, জীপ রাখতে হয়, এসবের খরচ তো উঠাতে হবে।

—দেখুন···বললাম!

—দেখি, আগামী হপ্তায় আমি একবার যাব।

লালবদন মনে মনে ভাবল, গেলে যাবে। তার কি করার আছে? ওদের সঙ্গে মারামারি করবে? সে কি করে ঠেকাবে?

এখন তার মনে হল, সব কাজকারবার এখানে কেন্দ্রীভূত করে ও সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় নি।

বিন্দা সিং, পান্না খারোয়ার, বিরন ভোগতা, অনল তলোয়ার নয়াখেড়ির লোকদের বলল, মৌয়া, বিড়িপাতা, লাক্ষা, সব সরাসরি বেচবে।

তেতরি বলল, লাক্ষা তো সরকারের কেনার কথা।

—তারা কেনে?

—কোথায় আসে? এদিকে হুকুম জানায়, সিরিফ সরকারী লোককে বেচবে। কিন্তু অফসর নিজে তো ব্যবসা করে। সরকারী লোকজনই ওর দালাল। সারাদিন বসে থাকো, লাক্ষা জমে যাবে, তখন দালালরা এসে তিন চার টাকা সেরে কিনে নেবে।

—লালবদন কেনে না?

—এখনো তো কেনে নি।

—ওই কিনবে।

—এ ববুয়া! তোমরা যেও না, আমি যাব।

—মৌসি, তুমি তো খেড়ি থেকে আসো নি।

—না।

ঝুঝার অবধি কৌয়ারের এলাকা। ঝুঝার ছাড়িয়ে গেলে জঙ্গল। সে জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেখা যায় পাথর বাঁধানো পথের কিছু চিহ্ন। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জংলী ঘাস গজিয়ে গেছে। পথ ঢেকে গেছে জঙ্গলের পাতায়। এ পথ গ্রামবাসীর কাছে এখনো মেদ্‌নী সড়ক নামে পরিচিত। শোনা যায় যত জায়গায় ছোট ছোট পাথরের কেল্লা গড়েছিলেন মেদিনী রায়, তত জায়গায় পাথর ফেলে পথও করেছিলেন।

তারপর আন্দোলিত উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে পাথরের ছোট কিল্লা। কিল্লা ঘিরে গড়খাই ছিল, একদা ঢাই নদী থেকে নালা কেটে সে গড়খাইয়ে জল আনা হত। সে নালা বুজে গেছে কবে, গড়খাই এখন শুকনো। তার বুক ভরে গেছে ঝরা পাতা ও আগাছায়। পচা পাতার সার পেয়ে আগাছাগুলি বন্য, সবুজ উদ্ধত। সবাই বলে কোনো এক লড়াইয়ের পর গড়খাইয়ের বুকে ফেলে দেয়া হয়েছিল বাদশাহী টাকা বোঝাই ছোট কলসি। কাহিনীর সত্য মিথ্যা যাচাই করতে কেউ আসে নি।

কিল্লার প্রাকারটা আছে, আছে পাথরের দালান, তার ছাত আছে, কিন্তু বুরুজ, আর অন্য সব কিছু ভেঙে পড়েছে দীর্ঘকাল। তবে প্রবেশ পথ সুরক্ষিত করতে পারলে ভিতরে জায়গা অনেক। সবচেয়ে ভালো পাথরের চৌকো সুগভীর কুয়োটি। ঢাই নদী যখন পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে নিচে নেমে বহে যায়, তার কুণ্ডী থেকে কাটা নানা পরিষ্কার করার পর সর্বদাই কিছু জল বহে আসে এখানে।

এ কিল্লাকে পর্যটন-দপ্তর ট্যুরিস সেণ্টার করবে। এমন আশা ছিল বনবিভাগের। কিন্তু দেখা গেল খরচে পোষাবে না। জঙ্গল, জানোয়ার কমলদহ ঝিল, প্রাচীন পলামু ফোর্ট, সবই বেতলায় আছে। বেতলায়

ট্যুরিসদের থাকার আরামদার বন্দোবস্ত আছে। এটা রিজার্ভ ফরেস্ট। তেমনিই থাকুক।

এখানেই বিন্দা সিংদের নিজস্ব আস্তানা। পথ চিনে আসতে পারে শুধু তেত্‌রি ভূঁইন। বিন্দা যখন বলল, মৌসি, তুমি তো খেড়ি থেকে আসনি? তেত্‌রি মাথা নাড়ল।

—এখন তো নয়া খেড়ির বাসিন্দা আমি।

ছিলে কোথায়?

—ঝুঝারে জন্মেছিলাম···কৌয়ারের বাপ ঝুঝার জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সবাই জানত, ঝুঝারের লোকরা মরে গেছে। সকলে তো মরেনি। পালিয়ে কিছু লোক জঙ্গলে আসে। তারপর গেলাম টাহাড়ে। তারপর গেলাম কয়লাখাদানে। তারপর সেখানেই দেখা বরজু ভূঁইয়ার সঙ্গে।

—কোন বরজু? কৌয়ারের বরজু?

—আর কে! সেই নিয়ে এল আমাদের। বলল, থাক তোরা ছু'ঘর। আমি আসব-যাব।

—সে আসে?

—মাঝে মাঝে। সে আমাদের কিল্লা চিনিয়ে দিয়ে গেছে। বলেছে, তেমন জুলুম দেখলে এখানে লুকাবি।

—তুমি লালবদনকে চেনো?

—আমিই যাই কথা বলতে।

নিশ্বাস ফেলল তেত্‌রি। বলল, কি করব! কুনারী ভূঁইন নয় গল্প কথা হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকোরদের খিদে তো মেটে না। কে যাবে, কাকে দেখবে, কাকে তুলে নিয়ে যাবে, কে বলতে পারে?

—মৌসি, তুমি তো ভয়ও পাও না।

—ববুয়া, অনেক দেখলাম, আর ভয় থাকে?

তারপর বলে, ঝুঝার, গাইবানী, বড়াটোলি, কুম্‌হারপুর, বিশালগড়, সব জায়গা থেকে যত কামিয়া পালিয়েছে, তাদের তো আমিই এনে কিল্লায় তুলতাম, আজ বউ বাচ্চা চলে এল, তারপর দিন এল তার মরদ, সব এখানে থাকত তারপর ভেগে যেত।

—মৌসি, তুমি ফৌজ নও, ক্যাপ্টেন। পালাত কোন পথে?

—উত্তরে ঘুরে গেলে কৌয়ারের জঙ্গল। এখন তো কেউ ঢুকে না। কুনারী ভুঁইন নাকি প্রেত পিশাচ হয়ে ঘুরে জঙ্গলে।

—কৌয়ারও ঢুকে না?

—না না, ভিতরে ঢুকে না। তা রাতে ধরো ওই জঙ্গলের উত্তর দিয়ে চলে গেছে ওরা। বেশি না হোক, দশ বিশটা ঘর তো গেছে।

—পালিয়ে বাঁচতে হল?

—বেঁচে আছে, না মরে গেছে, তা বলতে পারি না। লেবার দালাল তো বলত, বাইরে গেলে কাজ আছে, খাওয়া মিলে, টাকা মিলে। জানি না, বিশ্বাস হয় না।

—লেবার দালালের খপ্পরে পড়লে তারা কামিয়াই বনে যায় আবার।

—সব জায়গায় কামিয়ৌতি? সব জায়গায় কৌয়ার?

—স—ব জায়গায়।

—গরীবের কোনো সাহারা নেই। বিন্দা সিংয়ের চোখ নেচে উঠল। সে বলল, লড়াই না করলে হক মিলবে না।

—গরীবের কোন হক থাকে না ববুয়া।

—থাকে মৌসি, থাকে। কিন্তু সব লুকিয়ে রাখে কৌয়াররা। আমরা তো তাই জানতে চাই।

—বরজু আর বিশালও তো চেষ্টা করেছিল।

—তাতেই মানুষ অনেক জানল।

—লড়াই।

—আরে! তোমরা যে মৌয়া সরাসরি বেচে দিচ্ছ, এটাও তো লড়াই।

তেত্‌রি বিড়ি ধরিয়ে বলল, বিড়িপাতাও বেচব।

—আমরা চাই মৌসি। তোমাদের গৈর মজুরোয়া খাসজমিনে তোমাদের হক থাকুক। চাই, মালিকের মাঠে কাজ করলে সরকারী রেটে মজুরিও পাও।

—কে দেয়, ববুয়া? সরকার তো সবাই। জঙ্গল বাবুই কি

বিড়িপাতায় দাম দেয়, না মুখিয়ারা রাস্তা বানালে, কূয়া কাটলে সাচাই মজুরি দেয়?

—সহজে দেবে না, আদায় করতে হবে।

—কৈসে?

—যেমন মৌয়ার দাম আদায় করলে? তেত্রি দূরে নিষ্পত্র ডালে পলাশ ফুলের আগুন দেখতে দেখতে বলল, মৌয়ার কাল তো ফুরায়নি। মৌয়ার কাল আর আমাদের কপাল যেন একসঙ্গে বাঁধা। কত ছোট ছিলাম, বনে মৌয়া কুড়াতে যেতাম! জঙ্গল থেকেই আমার পিসিকে তুলে নিয়ে যায় ঠাকোরের লোক। বাবা আর কাকা তো তাকে খুঁজে খুঁজে···খুঁজে খুঁজে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর ঘর করতে যাবে, পনের বছর বয়স ছিল···পরদিন দেখা গেল কুয়োতে সে ভেসে উঠেছে! মৌয়ার কাল ছিল!

—ওরা মনে করে সবই ওদের দখলে।

—মৌয়ার কালই তো ছিল, ঝুঝার যখন জ্বালিয়ে দেয়? আর দেখ! মৌয়া আনতে গিয়েই কুনারী ভুঁইন···আহা! দলমলে মেয়ে গো! ওর আর বিশালের কি ভালবাসা যে ছিল···থাক গে ববুয়া! কৌয়ার এত সহজে ছেড়ে দেবে না।

—জুলুম উঠাক, এবার মার খাবে!

—এত সোজা নয় ববুয়া! লারাতুতেও পুলিস চৌকি বসে গেছে। পুলিস আর জমিদার তো বহোত দোস্তি লাগে!

—মৌসি অনেক ভাবো!

তেত্রি বলে, ভাবনা এসে যায় ববুয়া। আমার ছেলেটা থাকলে তো তোমাদের বয়সীই হত।

—ছেলে ছিল তোমার?

—মরদ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল, যখন টাহাড়ে গেলাম। টাহাড়ের পর···

—গেলে কয়লাখাদানে! আর বরজুর সঙ্গে দেখা হল।

—তার আগে খালারিতে সিমেন্ কারখানায় গেলাম কুলী খাটতে,

তো সিমেনের বস্তা বোঝাই টারাক উল্টে গিয়েছিল···আমাদের পাঁচজন তো মরে যায়। ছেলেটা জোয়ানও হয়েছিল···

—একাই গেলে খাদানে ?

—ওই যারা রইল তাদের সঙ্গে। এই পেট···আর এই ভুখ, এ তো ছেড়ে যায় না। চলি ববুয়া।

—আঁধার হয়ে এল মৌসি।

—আমার তো এ পথ চেনা ববুয়া !

তেতরি চলে যায়।

অনল তলোয়ার বলে, কৌয়ার জানবে ঠিকই।

॥ নয় ॥

কৌয়ার সবই জেনেছিলেন।

—লালবদন ওদের কাছে মৌয়া কিনছে ?

তশীলদার বলল, সরাসরি।

—তোমরা কি করছিলে ?

—ওরা নয়া খেড়ির লোক।

—ও ! জমি কিনে বসত করছে ?

কৌয়ার গেলেন থানায়। লারাতুতে থানা ছিল না, থানা হয়েছে। ও. সি'র তাঁকে পছন্দ নয়। ও. সি. টাউনের ছেলে। তার এই নতুন থানা, নতুন কোয়ার্টার, এই জঙ্গল, এই নীরবতা, কিছুই পছন্দ নয়। সিনেমা দেখতে হলে যেতে হয় ডালটনগঞ্জ, এখানে মানুষ থাকে ? এ অবধি কোনো ঝামেলায় পড়েনি, সেই রক্ষে। পরিচয় না জেনে এক এমেলের শালাকে পতিতালয়ে হল্লা করার জন্যে এক রাত থানা লকাপে রেখেছিল। সে জন্যেই এই পানিশমেন্ট পোস্টিং হয়েছে।

আসার আগে শুনে এসেছে লারাতুর কৌয়ার একজন কুখ্যাত লোক। লোকটা চিড়িয়াখানার বাঘকে মানুষ খাইয়েছে। এমন অত্যাচার নেই যা করেনি। বন্ধুরা বলেছে, সিনেমায় অত্যাচারী জমিদার যা দেখেছ, কৌয়ার তার ওপরে যায়। ও দশটা অম্রীশ পুরী।

—কোয়ারের ক্ষমতা কেমন ?

—ওর চেয়ে অসৎ জমিদারদের সঙ্গে এস. পি-র সম্পর্ক ভালো। ও তো জানোয়ার। কারো সঙ্গে সম্পর্কও রাখে না। আরে পালামৌয়ে তো জমিদার অনেক, ওর কথাই বা কাগজে বেরোল কেন ? তাহলেই বোঝো, টাউনে ওর শত্রু কত।

—জানি না কতদিন থাকতে হবে।

—ভাবীকে নিয়ে যাবে না ?

—সে তো বাপের বাড়ি বসে আছে। বাচ্চা হলে তবে তো! তবে এ জঙ্গলে তাকে আনব না। বাচ্চার বা তার কিছু হলে ডাক্তার পাব না, বিজলীও নেই।

—ওখানে একটা মেয়ে রেখে নিও।

—ছি ছি! অমন কথাও ব'ল না।

প্রথম সাক্ষাতে কোয়ারও এক কথাই বলেন। তাতেই ও. সি. আরো বিরূপ হয়ে যায়।

ও. সি. জাতে কায়স্থ। কিন্তু ওর ঠাকুরদা ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব। তাই সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত।

কোয়ার প্রথম দিনই তাকে একজোড়া মোরগ, এক টিন ঘি ও সরু চাল পাঠিয়েছিলেন।

ও. সি. সে-সব ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

হেড সিপাহী বলে, কোয়ারের জিনিস ফেরত দিয়ে দিলেন হজৌর! ক্রোধী মানুষ!

ও. সি.-র তখনো গা গোলাচ্ছে।

সে বলল, কি বলছেন ? মুরগি ? আমি পিঁয়াজ অবধি খাই না, আমাকে মুরগি পাঠাল ?

—চাল ঔর ঘি তো দোষ করে নি।

—সব একসঙ্গে এনেছে না ? আমাদের বৈষ্ণব বাড়ি, আমার পূর্ব-পুরুষের শাপ লেগে যাবে। জীবহত্যা ? ছি ছি, সে ভাবলেও পাপ।

—জী হুজৌর। তবে···দোষ নেবেন না···জিনিসটা নিয়ে নিতেন ···সিপাহীদের দিয়ে দিতেন···

—তা হয় না পরসাদজী।

—ফল দিলে নেবেন তো? কৌয়ারিন খুব পূজাতাজা করেন, ফল মিষ্টান্ন পাঠান···

—ফল এলে···আপনারা খাবেন···যে বাড়িতে মাছ মাংস চলে সে বাড়ির কোন কিছু খাওয়াই আমার নিষেধ।

—পুলিশের চাকরি নিলেন···আপনি সজ্জন লোক···কোন আপিসে কাজ করতেন···

—চাকরি পেলে কে চাকরি ছাড়ে? যেতে পারতাম ব্যাঙ্কে···কিন্তু মা বেঁকে বসলেন যে কটক যেতে দেব না। এক ছেলে হবার যে দায় কত।

কৌয়ার এরপরেই থানায় এলেন।

বললেন, আপনি আমাকে অপমান করেছেন। আমাকে অপমান করে এখানে কাজ করবেন? আরে! কায়স্থকে ও. সি. করে নিয়ে এল! এখানে দেবে রাজপুতকে।

—আপনি আমায় অপমান করেছেন।

—আমি! কৈসে? কাহে? আপনি আমার সমান দরের মানুষ, যে আপনাকে অপমান করবে কৌয়ার? পলামুর সবচেয়ে বড় জমিদার?

—অপমান করেছেন! আমি বৈষ্ণব, জীবহত্যা করি না। আর মাছ মাংস ছুঁই না। আপনি আমায় কি কি পাঠিয়েছিলেন বলুন তো?

—বৈষ্ণব! কায়স্থ, তাতে বৈষ্ণব! টাউনে জেলারও কায়স্থ, কিন্তু তিনি মাছ মাংস জবর খান!

—আর আমার ঠাকুর্দা যখন বৃন্দাবনে যান, স্বামীজী এসে তাঁকে ঠাকুরের মালা দিয়েছিলেন, জানেন? আমি মাকে নিয়ে সকল বৈষ্ণব তীরথে গিয়েছি।

—পুলিশী কাজে যখন মার জখম করেন, গুলি চালান, সে কি বৈষ্ণব মতে করেন?

—সে তো ছুটি। ছুটি করতে হবে না?

—বন্দুক চালিয়ে মানুষ মেরেছেন?

—কখনো মারি নি।

—হা ভগবান! কি আজব চিড়িয়া ভেজল! বিয়ে-শাদি করেছেন? না বরমচারী হয়ে আছেন?

—না না, বিয়ে করেছি বই কি।

—কোয়ার্টার ভাল? আমার এলাকায় আমাকেই খবর নিতে হবে তো! কে দেখবে আপনাকে?

—কোয়ার্টার···ভাল ··

—বিজলীও এসে যাবে। তা স্ত্রীকে এনেছেন?

—না, এখানে আনবও না।

—কেন, টাউনের মেয়ে?

—এখানে আনব না। জঙ্গলে থাকতে পারতে না। আমিই হাঁপিয়ে উঠি···

—তা তো হতেই পারে। কিন্তু বউ নেই বলে উপোসী থাকবেন কেন?

ও. সি.-র ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল।

—কি বলছেন আপনি কোয়ারসাহেব?

—পুরুষ মানুষ, জোয়ান বয়েস!

—আপনি···

—না না, রাখেল রাখতে বলছি না। বলেন তো আমি পাঠিয়ে দেব···জঙ্গল তো···জংলী ভূত সব, এখানে ওখানে ঘোরে···পাঠিয়ে দেব।

—ওসব কথা মুখেও আনবেন না দয়া করে।

আওরতকে ধরে এনে বেইজ্জতি করব আমি? ছি ছি, সরকারী অফসর হয়ে? আমিই যদি এ কাজ করি, তাহলে ওরা কার কাছে দৌড়বে বিপদ হলে?

কোয়ারের মুখ থমথমে হয়ে গেল।

—সিনিমার ডায়লোগ শোনাচ্ছেন। পুলিশের উর্দির ইজ্জত? ওসব টাউনে গিয়ে শোনাবেন। পুলিশের উর্দির কোন ইজ্জত নেই। ছোটজাতের আর জংলী আদিবাসী আওরত আর পুলিশ এদের কোন ইজ্জত নেই। পুলিশ আমরা খরিদ করি।

—আপনি দয়া করে আসুন।

—লারাতু থাকতে হলে আমার কথায় চলতে হবে। নইলে বেরোতে হবে, মনে রাখবেন।

কৌয়ার বেরিয়ে যান। ও. সি. মাথার রগ টিপে বসে থাকে। হেডসিপাহী এক গেলাস জল রাখে টেবিলে। বলে, ও কিছু নয়। আপনাকে বাজিয়ে দেখতে এসেছিল।

ও. সি. পরদিনই ডালটনগঞ্জে যাবে ঠিক করে। এ চাকরি করতে গেলে কত ফ্যাসাদ সে কি জানত?

হেডসিপাহী বলে, মৌয়া বেচার ঝামেলা অনেক দূর গড়াবে মনে হচ্ছে।

—এ তো জুলুম! সরকারী ফরেস থেকে মৌয়া উঠাবে, সাউকে বেচবে, তাতেও জুলুম?

হেডসিপাহী করুণামিশ্রিত গলায় বলে, হুজৌর! লারাতুতে তো সরকার ঢুকতেই পারে নি এতকাল। কৌয়ারের রাজই চলেছে এতকাল। এ থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোস্টাপিস, রাস্তা, বাস এ তো কয়েক বছরের ব্যাপার।

—ছেলে তো এরকম নয়?

—সব সমান, হুজৌর!

—এরা মৌয়া সরাসরি বেচল লালবদনকে, সাহস পেল কোথা থেকে?

—এরা তো এখানে সবে এসেছে। সেই খেড়ি-বাঁধের সব আদিবাসী লোক।

—নয়া-খেড়ি কি লারাতুর মৌজা?

—না, খাস জমি। আর, ওরা সরকারী পোরমিট নিয়ে ঘর তুলেছে।

—তাই বলুন।

—এদের সাহস আছে।

টাউনে ডি. এস. পি. বললেন, সাহস আছে, থাকা ভালো। তবে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে, সাহস জোগাবার লোক আছে কিনা।

—কারা সাহস জোগাবে সার?

—তা দেখা আপনার কাজ।

—এরা তো খেড়ি-বাঁধের ব্যাপারে লড়াই করে ক্ষতিপূরণ আদায় করে তবে এসেছে। চিরকাল কৌয়ারের রাজত্বে বাসও করেনি। সরকারে ওদের খুব বিশ্বাস স্যার!

—কিসে বুঝলেন?

—কুমার খারোয়ার সেদিন···ফরেস্ট বিট আপিসে···মৌয়া কুড়াবার পারমিট নিয়ে গেল। সেই বলছিল, সরকারই তো ক্ষতিপূরণ দিল! সরকারকে আর্জি দেব, এদিকে একটা স্কুল হোক।

—তাই না কি?

—কুমার খারোয়ার চেরো, এরা অনেকটা অন্যরকম! বলছিল, চাষের জমিও কিনতে চায়।

—সজাগ থাকবেন। দেখতে ভালো মনে হয়, আবার ভিতর ভিতর দেখা যায় শয়তানী।

—হ্যাঁ স্যার।

—উগ্রপন্থীরা এখন এখানেও ঢুকে পড়েছে তো, সেজন্যেই সজাগ থাকা প্রয়োজন।

—হ্যাঁ স্যার।

—কিছু বলছিলেন?

—লারাতুর···কৌয়ার - বড় কঠিন লোক!

—হ্যাঁ। পরমজিৎ সিং কৌয়ার! যাক গে, দেখবেন ওদের সাহস জোগাতে কেউ না এসে জোটে। জানলেই জানাবেন। আপনি একেবারে নভিস! কখনো এমন এলাকায় কাজ করেন নি!

—না স্যার।

—কাউকে ভয় পাবেন না। আপনি পাবলিক সারভেন্ট, ডিউটি করে যাবেন, ব্যস্।

—হ্যাঁ স্যার।

—উগ্রপন্থী ধরতে পারলে প্রোমোশান, ভালো জায়গায় বদলি, সব হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ স্যার।

—শুনেছি আপনি রিলিজিয়াস! সে তো আরোই ভালো। এই উর্দি, এই ডিপার্টমেন্ট, ধর্ম, সব আপনাকে বাঁচাবে বিপদে।

—হ্যাঁ স্যার।

—সেকেণ্ড অফিসার···না, এখনো তো পাওয়া যায় নি। পেলেই পাঠিয়ে দেব।

—একার পক্ষে···এরিয়াও বড়···

—লারাতু নিয়ে ভাবি না। কৌয়ারের ভয় সবার আছে। ওখানে কিছু হবে না।

—হ্যাঁ স্যার।

ও. সি. বেরিয়ে আসে ; টাউন, টাউন! টাউনের পরে ওই জঙ্গল! হায়, রাজপুত ডি. এস. পি., রাজপুত এস. পি., রাজপুত ডি. আই. জি., রাজপুত আই. জি.!

কায়স্থ সন্তান ও. সি.-কে বাঁচাবে কে? নিজের দুঃখে অভিভূত ও. সি, ট্রানজিস্টরের ব্যাটারি ও তিনটি গুলশান নন্দার বই কেনে, সচ্. ইসাবগুল, চা ও একছড়া কলা। রাতে না ফিরতে হলে ভালো হত। কিন্তু কাল হাটবার, লারাতুতে যত ঝামেলা হাটবারেই হয়। হাটের দিন মাতলামি বাড়ে, মারামারিও। মুরগা লড়াই আর আদিবাসী মেয়ে দেখতে বাসবোঝাই লোকজন মাঝে মাঝে যায়।

সে সময়ই তো পুলিশের খবরদারী বেশি দরকার। ও. সি. শুনেছে, জঙ্গল জায়গার হাটে মেয়ে ফুসলানোর কাজও চলে।

ছি ছি! কি অধর্ম! ধর্ম ও অধর্ম, নারীর ধর্ম সতীধর্ম, ঘুষ নেয়া-

দেয়া মহাপাপ, সকালে দোর খুলে কুঁজো বা বামন, বা 'ডান-পা' খোঁড়া লোক দেখলে ঘোর অমঙ্গল, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বা অজাতে বিবাহ করলে সে বিবাহজাত পুত্রের জল পিতৃপুরুষ নেয় না, বিধবা যদি বিয়ে করে, তবে সে তিনটে কুলকে নরকে নিমজ্জিত করে, পিতৃকুল, প্রথম স্বামীর বংশ ও দ্বিতীয় স্বামীর বংশ, এমন সব ধারণার মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত হয়ে তারপর এই জঙ্গলী লারাতুর বুক দিয়ে পিচঢালাই রাস্তায় ছুটে চলা বড় মুশকিল। ও. সি.-র মনে হয়, ও অসহায় এবং চারদিকে শত্রু।

এই জঙ্গল শত্রু, কৌয়ার শত্রু, অধিবাসীরাও তার অজানা। এমন নির্বাসনে থাকার জন্য সে তৈরি হয় নি। বউকে অবশ্য তা লেখা চলে না। তার পেটে ও. সি.-র বংশধর। তাকে কাব্য করে চিঠি লিখতে হয়। আহা, "শোলে"র হেমা মালিনীর মতই যৌবনবতী তার বউ, যদিও মুখটি নেপালী ধাঁচের, চোখ ছোট ছোট, ঠোঁটটি মোটা, কিন্তু বড়ই ভাব স্বামী ও স্ত্রীতে।

কৌয়ার কিনা ও. সি.-কেই কুপ্রস্তাব দিল?

লারাতুতে ঢুকতে লালবদনের গোলার সামনে একটি ট্রাক ও কিছু লোকের নড়াচড়া দেখতে পায়। জীপ থামিয়ে ও. সি. বলে, কি হল, সাউজী? লালবদন এগিয়ে আসে।

—কিছু হয় নি তো?

—কি উঠাচ্ছেন অন্ধকারে?

—মৌয়ার বোরা।

—এখন?

—ট্রাক পেলাম, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—ও!

থানায় ফিরতে হেডসিপাহী বলে, তশীলদার সিং এসে লালবদনকে বলে গেল, কৌয়ার মনে করে এ মৌয়া বেচার হক তার, গ্রামবাসীর নয়।

—সে তো জুলুম!

—এখানে ওটাই আইন।

—যা হোক, তারপর?

—লালবদনকে জানালাম। ও গ্রাম থেকে মৌয়া কিনে এনেছে আজ। সেও সন্ধ্যার পর। সেই মৌয়াই চালান হল।

—এরপর?

—লালবদনের গোলাতে তো পাবে না। তখন নয়া খেড়ি গিয়ে ত্রাস উঠাবে।

—থানায় আমরা খবর পেয়েও বসে থাকব?

—কোথায় খবর হুজৌর! মুখের কথায় থানা দৌড়াতে পারে। ডায়েরি কোথায়। যতক্ষণ না এফ. আই. আর. হচ্ছে, খবর নেবেন কেন?

ও. সি. বুঝতে পারে আজ রাতে ট্রানজিস্টারে "ছায়াগীত" শুনতে শুনতে বউকে চিঠি লেখার যে পরিকল্পনা করেছিল, তা বাতিল, হবে না। হেডসিপাহী সব ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

তারপর ও বলে, তশীলদার লালবদনকে জানাল কেন? তশীলদার কৌয়ারের লোক।

হেডসিপাহী সস্নেহে ও. সি.'র দিকে চেয়ে থাকে। কি করে এই আনাড়ী, নির্বোধ, ভালো মানুষটা এখানে থাকবে কে জানে! সম্ভবত ওকে অপদস্থ হবার জন্যেই পাঠিয়েছে এখানে। গভীর উদ্বেগে ও আন্তরিকতায় বলে, আমার বলা সাজে না, কিন্তু হুজৌর আমার তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বিশ বছর কেটে গেল, পাকা মাথার কথা একটু শুনুন।

—বলুন না। আমি তো সর্বদা বলছি সহযোগিতা করুন। আর কোন কথাটা শুনছি না? তবে হ্যাঁ, ঘুষ-ঘাষ নিতে পারব না। আর মুরগি মাংস ছোঁয়াছুঁই খেতে পারব না। তার চেয়ে চাকরি ছেড়ে দেব। আমার পিতামহ তো শেষ জীবনে পয়সা ছুঁতেন না। চিমটা দিয়ে পয়সা তুলে ভিখারিকে দিতেন। খুব সদাচারী পরিবার।

—এ নোকরি বড় নোংরা হুজৌর!

—নসিব! যাক গে, কি বলছিলেন?

—কি বলি। আপনি বুঝেন না, তাই বলছি। এ কথা কোয়ারও জানেন না। ওই তশীলদার…লুকিয়ে বেনামে কাঠ চেরাই কল খুলেছে লালবদনের মদতে। আর লরীর বিজিনেসও করবে। তবে তশীলদারে লালবদনে দোস্তি আছে। তাতেই এ-ওকে দেখবে।

—আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

—আপনি ভাবছেন কেন?

—আপনি বা মুখ খুলছেন না কেন? লালবদন আর তশীলদার, দুজনেই টাকা দিচ্ছে আপনাকে।

—ঝক্কিটা পোয়াচ্ছি তো আমি। আর সবাই কিছু ঘুষ নেয় না।

—এ তো ধরম কথা হল না হুজৌর! পুলিশ হলে ঘুষ নিতে হবে। ঘুষ নেন না, এ জন্যেও আপনার দুশমন বাড়ছে।

—আমি পারব না। আমার ভয় করে।

—আমরা কি সাধু হয়ে যাব?

—আপনারা,…যা করেন। করুন না।

—ঘুষ নিলে আপনার কবে প্রোমোশান মিলে যেত।

—ও সব কথা বলবেন না।

—জঙ্গলে থাকবেন, অথচ…

হুজৌর। আমরা এগুলোকে বলি জঙ্গল অ্যালাওয়েন্স! মাইনেতে যদি হাত পড়ল, তবে আর পুলিশের চাকরি করলাম কেন? যান, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন।

—সিপাহীজি। এ জঙ্গল আপনার ভাল লাগে?

—লাগে হুজৌর। টাউনে গেলে হাঁপিয়ে উঠি।

—ডি. এস. পি. বললেন, উগ্রপন্থীরা জেলায় ঢুকে পড়েছে।

—না হুজৌর। কোয়ার থাকতে কেউ ঢুকবে না। সে তো গরীবকে, অছুতকে, আদিবাসীকে মাথাই উঠাতে দেয় না। দেখবেন, নয়া-খেড়ির গরমও ভেঙে দেবে। জঙ্গলে শের থাকলে কি লাকড়া ডাকে? কোন গোলমাল হবে না।

—হবে তো হোক, আমি থাকতে যেন না হয়। যার যা ইচ্ছে করুক, কৌয়ার বুঝবে। আমি কোন ঝামেলা চাই না। আমি শুধু নিয়ম মেনে কাজ করতে চাই।

—পুলিশকে তা বললে চলে না।

—কেন চলবে না?

—তা ছাড়া আপনি রাজপুত নন। অন্য জাতের লোক থানায় এলে রাজপুত মালিক রেগে যায়।

—কি ভয়ঙ্কর জায়গা!

—যান, হাত মুখ ধুয়ে শুতে যান। এই নিন, বাবা গৈবীনাথের পরসাদী ফুল। বালিশের নিচে রেখে দেবেন আর শান্তিতে ঘুমাবেন। খুব জাগ্রত দেবতা।

হাটের দিনটা সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। হাট বসে যে জমিতে সেটিও বনবিভাগীয়। তবে বনবিভাগে এমন জমি তো থাকেই, যেখানে কোনদিন গাছ লাগানো হয় না। হাটের দিন বেলা দশটা থেকে রাস্তায় মানুষ দেখা যায়। লালবদন সাউয়ের মস্ত চালাঘরে লালবদন লবণ, চাল, লঙ্কার গুঁড়ো, সাবান, দেশলাই, ভুট্টা, আটা, গামছা, কাপড় বেচে। নয়া-খেড়ির লোকরা আসার পর ক্রেতা কিছু বেড়েছে।

হাটের কিনারায় মদ বিক্রি হয়।

মোরগ লড়াই চলে, কয়েক ঘণ্টার জন্য সুপ্ত জনপদ জেগে ওঠে। ও. সি. ছড়ি হাতে ঘুরতে থাকে। হাটের ভিড়ে কি উগ্রপন্থীরাও ঘোরে? কেমন করে তাদের চেনা যাবে? তারা নাকি ভয়ানক উগ্র, ভয়ানক হিংস্র। মানুষ কেন উগ্র হয়, কেন হিংস্র?

ভাদ্রের প্রথমে আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। পালামৌয়ে প্রবল বর্ষণ কমই হয়। তবু কয়েক দিন ধরেই কিছু বৃষ্টি হচ্ছে, যে জন্য বাতাস ঠাণ্ডা, রোদেও তেমন তাপ নেই।

হেডসিপাহী বলে, সব ঠিক আছে হজৌর, কোন গোলমাল নেই।

ও. সি. বলে, আপনি তো আছেন, আমি থানায় যাই। থানা ছেড়ে থাকা ঠিক নয়।

হঠাৎ ভীষণ চেঁচামেচি শুরু হয়। কোথায়? লালবদনের হাটচালার সামনে। তশীলদারের গর্জন শোনা যায়। কৌয়ারের হুকুম, বোরা আমরা উঠাব।

নারীকণ্ঠে চীৎকার, কভি নেহী।

—আরে ছোড়্ কসবী!

—তোহার মা কসবী!

হেডসিপাহী বলে, ধরমনাশ! ও তো তেত্রি ভূঁইন! বাপ রে, রাক্ষসী বললেও হয়! যা চেঁচাবে আর গাল দেবে, সে ভাবা যায় না।

ও. সি. তড়িঘড়ি ওখানে যায়, পেছনে হেডসিপাহী। দৃশ্যটি অবিশ্বাস্য।

তশীলদার ও আরো চারটি লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এক ভীষণ কালো ও রুক্ষমূর্তি প্রৌঢ়া তশীলদারের লাঠি ঠেলে দিচ্ছে। অন্তত পনেরো-বিশজন মেয়ে ও পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে কয়েকটি মহুয়ার বোরা। মহুয়ার বোরা চিনতে অসুবিধা হয় না, ম' ম' গন্ধ!

—কি হয়েছে? এত গোল কিসের?

তেত্রি বলে, এসো দারোগা সাহেব দেখ!

তশীলদার বলে, কি দেখব? বোরা আমাদের।

লালবদন বলে, আমার দোকান ছেড়ে যাও বাপু, আমাকে বেচা-কেনা করতে দাও।

তশীলদারকে সরিয়ে দিয়ে ভীম সিং বলে, বেচলে আমরা বেচব।

তেত্রি চেঁচায়। তোরা কুড়িয়েছিস? জঙ্গল থেকে বয়ে এনেছিস? তোরা কত বছর ধরে আমাদের হকের জিনিস বেচবি?

ও. সি. বলে, তোমাদের পোরমিট আছে?

—জরুর আছে। একেক কিলো মৌয়ার জন্যে জঙ্গল আপিসের চার টাকা দেবার কথা। তো একেক বোরায় কত আছে তৌল করো? বিশ কিলো তো হবে? তবে তোমাদের হিসাবে কত হয় বলো?

তেত্রির সঙ্গী একটি যুবক বলে, আশি টাকা।

তশীলদার বলে, ওঃ! আশি টাকা! চুপ যা কুত্তা। তোর সঙ্গে কথা বলেছে কে?

যুবকটি তশীদারের জামা ধরে ঝাঁকি মারে।

—মুখ সামলে সিং! আমি ভক্ত খারোয়ার, আর খারোয়ার কখনো কামিয়া থাকে না। কারো অপমান সহ্য করে না। আমরা নয়া-খেড়ির লোক। তোমাদের কামিয়া প্রজা নই।

—তেত্‌রি এখন নয়া-খেড়ির লোক নাকি?

তেত্‌রি বলে, জরুর!

—ভুঁইয়া হয়ে ওদের সঙ্গে?

—তোর তাতে কি?

ও. সি. বলে, বোরা উঠাও, থানায় চলো। সেখানে ফয়সালা হবে।

তশীলদার বলে, বোরা ওরা উঠাবে না, আপনি চলে যান। আমরা বেচব।

ও. সি. বলে, বেচবেন তো, কিনেছেন ওদের কাছে?

—এই তো পাঁচ—পাঁচ টাকা এক বোরা।

ও. সি. মাথা নাড়ে।

—আপনারা আসুন, এরাও আসুক। ওখানে ফয়সালা হবে।

—কৌয়ারের লোক, ভোগতা, খারোয়ার, ভুঁইয়াদের সঙ্গে ফয়সালা করবে? থানায় গিয়ে? আপনি কি বলছেন?

তশীলদারকে পাশে ডাকে ও. সি.। বলে, এখন কয়েক বোরার জন্যে ঝামেলা করছেন? কাল লালবদনকে খবর দিয়ে কত বোরা পাচার করালেন?

তশীলদার চুপ।

তারপর বলে, এর ফয়সালা থানাতে নয়, নয়া-খেড়িতে হবে।

সেই যুবকটি হেঁকে বলে, তাই এসো। সেই ভাল হবে।

নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে। তশীলদার তার লোকদের নিয়ে চলে যায়।

তেত্রি বলে, এ সাউ! এবার কিনে নাও!

লালবদন বলে, থানায় যা, থানা থেকেই নেব।

ভক্ত খারোয়ার বলে, চল ভাই সব, উঠাই। চলুন দারোগা সাহেব, আমরা ডায়েরিও লিখাব।

ও. সি. হেডসিপাহীর দিকে তাকাল।

তার মুখ বোবা, পাথর।

লালবদনের দিকে তাকাল।

কাল রাত অবধি লালবদন ও তশীলদারের যে কামারাদোরি ছিল, তা গেল কোথায়?

মানুষগুলি থানায় চলে, হেডসিপাহী লালবদনের দিকে তাকায়, মাথা নাড়ে। লালবদন বলে, আমি বেচাকেনা শেষ করে গোলায় চলে যাব।

ও. সি. বলেন, থানায় যাবেন?

—থানায় যাব কেন? আমার সঙ্গে তো কারো বিবাদ হয় নি।

—আপনি তো দেখেছেন।

—কিছুই দেখি নি সাব! সারাতুতে থাকতে গেলে চোখে দেখা চলে না, কানে শোনা যায় না?

থানায় বস্তাগুলি রাখা হয়।

তেত্রি বলে, নাও দারোগাসাহেব, লিখে নাও। আমি বলছি, লিখে নাও।

ভক্ত খারোয়ার বলে, আমি বলব মৌসি!

তেত্রি ওর দিকে আগুন ঝরানো চোখে চায়, কঠিন গলায় বলে, তুমি কি জানো যে বলবে? মৌয়া আমাদের জীবন দারোগা সাহেব! জনম কোটে গেল মৌয়া কুড়িয়ে, আর ধোঁকা খেয়ে।

ও. সি বলেন, লিখুন পরসাদজী!

—তেত্রির কথা লিখব?

—জরুর।

—পরে লিখো সিপাইজী। আগে দারোগা সাহেবকে বলি। মৌয়া

থেকে আমরা মদ বানাই? খাই? না দারোগাসাহেব! মৌয়া···আমাদের···মৌয়ার ফুল শুকিয়ে ছাতু করে আমরা জলে মেখে সেঁকে খাই। মৌয়ার বীজ পিষে তেল করে বাতি জ্বেলেছি আমরা, কোথায় পাব কেরাসিন তেল? ফলের বীজের খোলটা বোরা বোঝাই করে ব্যাপারীকে বেচেছি, তখন কাপড়কাচা সাবান বানাত যারা, তারা কিনে নিত!

ও. সি অবাক, ভক্ত খারোয়ারও অবাক।

—পোরমিট নিয়ে মৌয়া কুড়াবে শুধু আদিবাসী আর গরিবরা। ফরেস্ আপিস কিনে নেবে চার টাকা কিলো। আগে শুনেতাম ছ'-টাকা কিলো। আর আমরা ফরেসের মৌয়াই উঠাই। কুনারী ভুঁইন খুন হবার পর কৌয়ারের জঙ্গলে তো কেউ ঢোকে না।

—তবে ফরেসকে বেচ না কেন?

—ওহি তো বাত! ফরেস কোনোদিন কেনে না। আর কৌয়ারের সঙ্গে ফরেস, থানা, সকলের তো বিবাদ! কুড়াই আমরা, ফরেস কেনে না। কৌয়ারের কুত্তারা আমাদের ছ'চার টাকা ফেলে দিয়ে বোরা নিয়ে নেয়, আর সরাসরি বেপারিকে বেচে দেয় আঠারো-বিশ টাকায়। মৌয়াতে হক আমাদের, আমরা কুড়াই, টাকা করে কৌয়ার।

—মৌয়াতে কত টাকা হতে পারে?

—আশপাশের বিশ-ত্রিশটা গ্রাম হিসাব করে নাও দারোগাজী!

ভক্ত খারোয়ার বলে, কৌয়ার বছরে আট লাখ টাকার মৌয়া বেচে, অবশ্য ভাগ দেয় ফরেসকে···পুলিশকে···মাপ করবেন দারোগাসাহেব। আমরা জানি, আপনি ঘুষ খান না। কিন্তু এই নিয়ম তো চলে আসছে।

তেত্‌রি বলে, নয়া-খেড়ির লোকগুলো সহবত জানে না গো। একটা বুড়ো লোক কথা বলছে, তার মধ্যে কথা বলা? তুই মৌয়ার কি জানবি রে ছোঁড়া? ছিলি এক জায়গায়, সরকারী টাকাপয়সা পেলি, সরকারী জমিনে ঘর তুলেছিস, আমাদের কথা কি জানবি?

—ঠিক আছে মৌসি, চুপ করলাম।

একটি মেয়ে মাথা নিচু করে বসে পায়ের নখ খুঁটছিল। সে হঠাৎ মুখ তোলে। ও. সি. চমকিত। ধারালো চোখমুখ, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।

—মৌসি বলছে বলুক। দারোগাসাহেব, লিখবেন তো? না অন্য কিছু লিখে নেবেন?

হেডসিপাহী মশকরা করে, তোরা তো বহোত লিখিপড়ি অওরত দেখে নিস কি লিখি।

—ঠাট্টা করছ?

—চুপ কর ছুঁড়ি। তা এবছর আবার ফরেস আপিস ডাকল, বছর বছর ডাকে! অফসর এল, কৌয়ার এল, খুব বাজনা বাজিয়ে একটা শালগাছ বসাল ফরেস আপিসের বাগানে। "বন বাঁচাও, গাছ লাগাও" এ সব বলল, আর সরকার আদিবাসীদের জন্যে কি কি দিয়েছে তা আবার বলল, মৌয়া, আর লাক্ষা, আর ফল-পাতা-ফুল। তখনি আমরা ঠিক করলাম, বিশ-ত্রিশটা গ্রামের কাছ থেকে আট হাজার মৌয়াগাছের পুরো ফসল তো কৌয়ার নেবে। এ বছর আমরা সরাসরি বেচব। বেচছিলাম, লালবদন কিনছিল। আঠারো টাকা দিচ্ছিল একেক বোরায়। কয়েক দিনে আমরা তো পঞ্চান্ন বোরা মাল বেচেছি। এবার লিখে নাও।

—লিখুন পরসাদজী।

—আজ আমরা নয়া-খেড়ি থেকে বিশ-পঁচিশ বোরা মৌয়া হাটে বেচতে আসি। ফরেসবাবু বলেছে মৌয়া তোমাদের, ঔর পোরমিটও দিয়েছে। বামিয়া কিনতে তৈরি ছিল। কিন্তু কৌয়ারমহলের তশীলদার সিং, ভীম সিং, ঢেকা গ্রামের মোহন যাদব আর জমাদার সিং, ছোটা-নালার গজন সিং, এরা লাঠি নিয়ে আমাদের মারতে আসে। বলে, জবরদস্তি মৌয়া নিয়ে নেবে, সরকারী ফরেসের মৌয়াতে হক ওদের। ওরা বিশ কিলো মৌয়া পাঁচ টাকায় নেবে বলে জুলুম উঠায়। তাতেই আমরা ডরে গেলাম আর দারোগাজীর কিরপায় মৌয়া বাঁচিয়ে থানায় এসে জমা করেছি। এখন আমাদের আরজি, কৌয়ারের জুলুম থেকে

বাঁচাতে হবে। হাঁ জী, আমায় নাম লিখো, মৌজা নয়া-খেড়ি, তহশীল বানগড়, বলক ওর থানা লারাতু। মেয়েটি বলে, চলো মৌসি টিপসহি দিবে

দাঁড়ালে বোঝা যায় মেয়েটি লম্বা। গায়ে জামা আছে, যদিও সবই মলিন ও ধুলোমাখা। টেবিলের কাছে গিয়ে ও বলে, টিপ দাও মৌসি। এ কি সিপাহীজী? আপনি তশীলদারদের নাম লেখেন নি? কেন লেখেন নি?

হেডসিপাহী বিস্ফারিত চোখে তাকায়। বলে, তুমি পড়তে জান?

—কেন জানব না? আমি যে পড়তে জানি, তা ফরেস আপিসও জানে। আমার বাবা খেড়িতে মাস্টারও ছিল, ওর ঘুরে ঘুরে সকলের সই, টিপছাপ জোগাড়ও করেছিল। আমাদের গ্রামে গান্ধী মিশন ইস্কুল করে দিয়েছিল না?

—তোমার নাম কি?

মেয়েটি চিবুক তুলে সগর্বে বলে, কোশিলা খারোয়ার। তুমি এদের নাম লিখো।

হেডসিপাহী বার বার মাথা নাড়ে ও নামগুলি লেখে।

ও. সি. বলে, তুমি···মৌয়া কুড়াচ্ছ?

—একটু হিন্দী পড়তে জানি বলে খরোয়ার মেয়ে মৌয়া কুড়াব না? মৌয়া কুড়াই, জঙ্গল থেকে কাঠ আনি, হাটে বেচি। দাও মৌসি, ছাপ দাও।

ভক্তু খারোয়ার বলে, দাঁড়া কোসিলা, একটু ভাবি।

তারপর ও. সি. কে বলে, দারোগাজী! লালবদন কিনে নিলে ভাল। নয় তো কাল আমরা নিয়ে চলে যাব! বাইশটা বোরা রেখে গেলাম।

—নিয়ে কি করবে?

—ফুল শুকাব, পিষব, সেঁকে নেব, পেটে খাব। তবে এটা আপনি জানলেন, হাটেও দেখেছেন, আমরা কোন হামলা করিনি। তাই আমরা আর্জি রেখে গেলাম, আপনি আমাদের দেখবেন বিপদ হলে।

কোসিলা হেসে বলল, ডায়েরি গায়েব তো হবে না? গরিব লোকরা আমীরদের নামে ডায়েরি লিখালে সে সব পাতা গায়েবও হয়ে যায়। বাঙ্কা থানায় দেখেছি।

তেত্‌রি মাথা নাড়ে বারবার, বলে, বিচার পাব? কবে পাব? এই কৌয়ার?

—আচ্ছা, তোমরা যাও।

ওরা বেরিয়ে যায়, কোসিলা ও. সি ও হেডসিপাহীকে চমকে রেখে গেছে। দুজনেই বিস্মিত।

—খারোয়ার মেয়ে এমন হয়?

লালবদন এ সময়ে ঢোকে ও চেয়ারে বসে। বলে, চেরো আর খারোয়াররা অনেকটা রাজপুতদের মত, চেহারাও অন্য রকম, ওরা রাজা ছিল পালামৌয়ে। চেরোদের জমিজমা থাকে, চাষবাসও। লেখাপড়াও অনেক দেখা যায়। এদের মধ্যে চেরো কে? আমি তো দেখিনি। খারোয়াররাও এখন খুব এগোচ্ছে। আর খেড়ি নদীর আশপাশে তো অন্য ব্যাপার।

—কি রকম?

—কালাদাস সাধু বহুকাল আগে ওখানেই স্কুল করে ছিলেন, পরে গান্ধী মিশন সেটা নিয়ে নেয়।

ঈষৎ হেসে বলে, পালামৌয়ে আদিবাসী—হরিজন মণ্ডলীতে ওই জায়গাটায় সব চেয়ে বেশি চতুর্থ শ্রেণী পাস লোক আছে, কামিয়াও কম। এ কোসিলা তবে গণেশ খারোয়ারের মেয়েই হবে।

—আপনি থানায় এলেন?

লালবদন চেয়ে থাকে ভুরু কুঁচকে। তারপর বলে, কত বোরা মাল আছে?

—বাইশ বোরা।

লালবদন নিশ্বাস ফেলে। বলে আপনার সিপাহী গতিরামের জন্যে সব সর্বনাশটা হল।

—সে কি করল?

—এক চোখ কানা গাইটাকে ও বেচবে না, বেঁধেও রাখবে না। সকালে ওটাকে যেদিন দেখব, সেদিনই হবে একটা সর্বনাশ, এ একেবারে জানা কথা।

হেডসিপাহী বলে, গৌমাতা, ভগবতী, এখনো দুধ দিচ্ছে, তাকে বেচে দেবেই বা কেন? সে কি দোষ করেছে? তোমার খারাপ হয়েছে বলছ, আমার তো খারাপ হয় না কখনো।

—যাক গে জী, যা হবার তা হল।

ও. সি. বলে, কিছু লেখাবেন?

—না। আর আপনি যদি এই বুড়োর কথা শোনেন, যা লিখেছেন তাও ছিঁড়ে ফেলবেন।

—আমাকে কাজ শিখাচ্ছেন?

—না, ভালো কথা বলছি।

—তশীলদার আপনার দোকানের সামনেই হামলা করল?

—ও তো নওকর। কৌয়ার বললে ও কি করবে?

লালবদন কোনো গোপন যন্ত্রণায় বলে, আমিই কি মৌয়া কিনতাম গাঁওলী মেয়েদের কাছে? তশীলদারের কাছে নিই, তাই নিতাম।

—কিন্তু সেটা তো বে-আইনী কাজ।

—আইন! অপনি কি ওই তেত্‌রির ডায়েরি নিয়ে কৌয়ারকে কথা বলবেন?

—জানি না। তবে ওরা তো বলেছে, ওদের উপর হামলা না হয় সেটা দেখতে!

লালবদন বলে, মৌয়ার মামলাও মিটে যাবে। কৌয়ার এতকাল ভোগ করছে সবকারী জঙ্গল, সরকারী জমি। সে কি ছেড়ে দেবে? আপনি বা এ মৌয়া কি করবেন?

—আপনি না নিলে ওরা নিয়ে যাবে, খেয়ে নেবে।

লালবদন ভেবে পায় না কি করবে। হাট উঠে গেলে মাথা চাদরে ঢেকে পান্না খারোয়ার আর বিন্দা সিং এসেছিল। ওরা বন্দুক দেখিয়ে বলে গেছে, ওই মৌয়া তুমি কিনে নেবে।

—আমাকে ছেড়ে দাও।

—বাইশ বোরা মাল, তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা হয়, আজ রাত দশটায় আমরা যাব, টাকা নিয়ে আসব, তুমি মাল তুলে নেবে সকালে।

লালবদন বলে, ওরা বেচতে চাইলে আসুক, টাকা দিয়ে যাক।

তারপর বলে, একেকটা সময় আসে দারোগাসাহেব, সব যেন ধাঁধা লেগে যায়। যখন এখানে এসেছিলাম, কত শান্তি ছিল। থানা হল, রোড হল, পোস্টাপিস হল, এখন তো বাস আসছে ছুটো, ট্রাক আসছে আর যাচ্ছে, আরোই শান্তি হল। কিন্তু সব তো মিছা। কিছু হবার নয়। সারাতু কৌয়ারেরই থাকবে আর। বিক্রমসংবতে পড়ে থাকবে।

—বিক্রমসংবৎ!

গভীর দুঃখে লালা বলে, কৌয়ার তো আংরেজি সাল মানেন না। তিনি বিক্রমসংবৎ মানেন। যাক গে, টাকা ওরা দিয়ে যায়, আমরা সবাই জিন্দা থাকি, তো এবার মৌয়া নিয়ে নেব। কিন্তু এ বছরই শেষ।

—কেন, তশীলদারের ট্রাকসার্ভিস্ হলে ব্যবসা জোর চলবে।

—কৌয়ারের কী বুদ্ধি নেই? ও সব বুঝেছে। ওর রাগ তশীলদারের উপর, আর হাঁ! নয়া-খেড়ির উপর।

রাতে লালবদনের ঘরে গেল হেডসিপাহী। বলল, সাউ! ব্যাপারটা কি বল তো? কি হচ্ছে?

—আমি বলতে পারব না।

—কেন? কার ভয়ে?

—আমি জানি না কিছু। আর তুমিও ভাই! যাওয়া-আসা বন্ধ কর। এখন দিনকাল খারাপ। জিলায় উগ্রপন্থীরা ঢুকে গেছে। টাউনে বহোত ইস্তাহার ছড়িয়ে গেছে কারা। পুলিশ জমিদার এক হ্যায়! পুলিশের কুত্তার ক্ষমা নেই। সবাই হন্সে হয়ে খুঁজছে ওদের।

—আমরা ভাবব কেন? কৌয়ারের ভয়ে এ দিকে কে ঢুকবে? তার অমন জঙ্গল পড়ে আছে!

—হাঁ, নিজের জঙ্গল ধরে রেখে সরকারী জঙ্গল কাটছে আর বেচছে। তুমি যাও।

হেডসিপাহী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, অমন কত ইস্তাহার তখন কৌয়ারের নামে ছেড়েছিল। ভোট আসলে আরো কত ছাড়বে। তা নিয়ে ভাব কেন? এদিকে শোনো, কোসিলা খারোয়ার লিখতে পড়তে জানে।

—জানতেই পারে। গণেশের মেয়ে।

—কেন ভয় পাচ্ছ?

—টাউনে যাই বলে। পুলিশ লাইনে বন্ধু অনেক, খবরও পাই। পুলিশ নাক চোখ কান খুলে চলে। সবাই তো এ দারোগার মত অনপড় উজবক নয়।

—নইলে লারাতু পোস্টিং হয়? সেকেন্ অফিসার আসছে না। আসবে কেন? লারাতুতে পুলিশের কি ফায়দা আছে? কৌয়ার পুলিশের মদতও নেয় না, আমাকে কিছু দেয়ও না। ওই মাঝে মাঝে কিছু দেয় তশীলদার। আরে! দেবে বা কেন? সে কি ও. সি-র ধার ধারে? মাঝে মাঝে দরকারে দিয়ে আসে ডি. আই. জি-কে।

—তাই বা কোথায়?

—হাঁ, কুনারী ভুঁইনের ব্যাপারে পুলিশ তো মদত করে নি।

—খেড়াটা দেখ, ভূতের জঙ্গল হয়ে গেছে।

—কে থাকবে? কোনো মানুষ থাকে না। খালি বড় বড় মনসা গাছ, আর পাথরের ঢিবা। মানুষতো ও পথে হাঁটে না।

—তুমি এসো। আমি শুয়ে পড়ব।

—ও ইস্তাহার নিয়ে ভেব না।

—সব বেচে দিয়ে চলে যাব।

—কাকে বেচবে?

—আমার সাধ্য নয়। ধানবাদের কোনো মস্তান, চাই বাসমালিক পাঞ্জাবী, চাই কোনো ঠিকাদার, খদ্দের পেয়ে যাব।

—নাও, গৈবীনাথের বেলপাতা নাও, মাথার নিচে রাখো, গৈবীনাথ তোমায় দেখবেন।

—দাও।

—হেডসিপাহী চলে যায়। বিশাল অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্য।

লালবদন কান পেতে থাকে। আর কৌয়ারমহলের ঘড়িতে এগারোটা বাজলে এসে দরজায় টোকা দেয় পান্না খারোয়ার ও বিন্দা সিং।

লালবদন টাকা, এগিয়ে দেয়। তারপর বলে, এই রসিদে সই করে দিন।

—দিলেন বেশি, রসিদে কম দেখাবেন?

—তোমরা এখানে থাকবে না, আমি থাকব। কম টাকায় খরিদ করছি জানলে কৌয়ার যদি ছেড়ে দেয়।

—এ আমরা সই করতে পারি না। লালবদন একটি শাণিত দা এগিয়ে দেয়। বলে, তবে আমাকে কেটে রেখে যাও।

পান্না খারোয়ার সই করে দেয়। নিচু গলায় বিন্দা সিংকে বলে, ওকে বিপন্ন করে আমাদের লাভ?

লালবদন বলে, জঙ্গল আপিসকে বাধ্য করো না কেন তোমরা? ওরা যদি সরকারী রেটে নিয়ে নেয়, সেই তো ভালো।

—এ একটা কথা বটে! তবে সরকার এখানে কৌয়ারের, না গরমেনের তাও জানি না। আর আদিবাসী যদি মৌয়ার সরকারী দাম পেয়ে যায়, তাহলে লাখ লাখ টাকার কারবার কে করবে এটাও তো ভাবতে হয়।

ওরা বেরিয়ে যায়। লালবদনকে অন্ধকার গহ্বরে ফেলে রেখে যায়। এরা কি সেই লোক। যাদের পুলিশ খুঁজছে? কিন্তু পুলিশলাইনও তো বলে, কৌয়ারের এলাকায় কোনো অদ্ভুত আদিবাসীর মাথা তোলা অভাবনীয় ব্যাপার।

কৌয়ার! কৌয়ার! এলাকার আট হাজার গাছের মৌয়া তুমি ভোগ করো, বাজারে বেচ। এরা পোরমিট নিয়ে মৌয়া উঠাচ্ছে, লালবদন কিনছে, তোমার এত জ্বালা কেন?

অতীব প্রত্যূষে হরনাম সিং বাটোয়ারের, জঙ্গল-ঠিকাদারের

ট্রাকে লালবদন বোরাগুলি চাপিয়ে দেয়। ও. সি. বলে, এত কমে কিনলেন ?

—ওরা নিতে হলে এ দামেই নেবে।

—মৌয়াতে অনেক নাফা ?

—হাটে দশ পয়সার ভাজা মকাই যে বেচে সেও নাফা করে দারোগাসাহেব। আবার জিনিসে কোন লস্ নেই।

সারাদিন কৌয়ার আসেন না বলে ও. সি. মনে খুব স্বস্তি পায়। ওর কাজকর্ম করে যে ছেলেটা, সেই বিট্টুকে ও বাড়ি থেকে এনেছে। বিট্টুকে বলে, আজ সাবান দিয়ে জামাকাপড় কেচে দে। ডাকঘরে যাবি, খাম আনতে দেব। বাড়িতে চিঠি লিখতে হবে।

॥ দশ ॥

ও. সি. আজ, কি আশ্চর্য! ফরেস আপিসে গিয়ে বিট অফিসারকে পেয়ে যায়।

—আসুন, আসুন দারোগাসাহেব!

ফরেস আপিস যেখানে, বিটবাবুর কোয়ার্টারও সেটাই। বাগান আছে, কুয়ো আছে, কিছু ইউক্যালিপটাস।

—শুনলাম আপনার ওখানে মৌয়া নিয়ে নালিশ করতে এসেছিল কারা, আর তশীলদার সিংয়ের নামে নালিশও করে গেছে ?

—ও কিছু না। আচ্ছা বিটবাবু, আপনারা তো ওদের মৌয়া তুলার পোরমিট দেন ?

—আপনিও পোরমিট বলছেন ?

—আদত পড়ে গেছে। সবাই বলে।

—হ্যাঁ, আমিই দিই। দেয়ালে দেখুন, সরকারী নির্দেশ টাঙিয়ে রেখেছি। যা লেখা আছে, সব তো করতে পারি না। পোরমিট দিয়ে দিই, কাকে দিই, তার গ্রাম কি, তশীল কি, পঞ্চায়েত কি, সব রেকর্ড রাখি। কেন ?

—তবে সরকারী দামে কিনে নেন না কেন? তাহলে তো ওরা হাতে টাকা পায়।

—চা খাবেন না? আমার বউ খুব ভালো চা করে। আমার চায়ের ব্যাপারে বড় খুঁতখুঁতি। রাঁচিতে "কুসুম ট্রেডার্স" কলকাতা থেকে ভালো চা আনায়, আমি ওদের কাছে চা কিনি। কলকাতা গেছেন?

—একবার। মাকে ডাক্তার দেখাতে।

আঃ বাঙালী! চা খেতে ওরাই জানে। দাঁড়ান, চা নিয়ে আসি।

—চা হয়ে গেল?

—আমার বউ সব বোঝে। আমার কাছে কেউ গেলেই চা করে ফেলে।

চা নিয়ে আসা হয়। চা-টা সত্যিই ভাল।

—আপনি বলছিলেন, মৌয়া আমি কিনি না কেন? না, এখানে আমি চেষ্টাও করি নি। আপনি কোমাণ্ডি গেছেন? লাপরা—ডালটনগঞ্জ লাইনে?

—না।

—সেখানে মৌয়ার দাম সরাসরি আদিবাসীদের দিতাম। আর কোমাণ্ডি ফরেসে যে তিন হাজার মৌয়া, আর বিড়িপাতা-চাষ, সবই এই কপিল শ্রীবাস্তবের হাতে করা। আদিবাসীদের শুধাতাম, কি গাছ লাগাব? ওরা বলতেই চায় না। শেষে বলে, যাই লাগাস, জমিদারের দালালরা আর অফসররা নিয়ে যাবে। আমরা হাতে পাব না।

বয়স কম ছিল, সরকার ছাপা অরণ্যনীতিতে বিশ্বাস ছিল। ফলে রোখ চেপে গেল। ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে লড়াই করে একটা সীজ্‌ন আদিবাসীদের হাতে মৌয়া আর বিড়িপাতার ন্যায্য দাম দিতে পেরেছিলাম। ফলে পড়ে গেলাম ওখানকার আদমখোর মোহন সিংয়ের আক্রোশে। বলল, মৌয়া আর বিড়িপাতা থেকে আমার রোজগার জান? তুমি কে! খোদ বনমন্ত্রী আমার ছেলের শ্বশুর। এখন

তোমায় বদলি করে ছেড়ে দিচ্ছি, নইলে তোমায় মেরে ফেলাই ঠিক ছিল।

—থানায় যান নি?

—গিয়েছিলাম। তখন সরকারে খুব বিশ্বাস ছিল তো! কিন্তু তারা ডায়েরি নিলই না।

—কি আফশোস!

—আফশোসের কি আছে বলুন? লারাতুতে আমি আগেও ছিলাম। মনের সাধে গাছ লাগিয়ে গেছি তখন পুরানা কিল্লা এলাকায়।

—সেখানে জঙ্গল তো আছে।

—গেছেন?

—শুনেছি।

—যাবেন না, রাস্তাই তো নেই। ওখানে জঙ্গল কেন আছে?

পর্যটন মন্ত্রী খোয়াব দেখেছিলেন, ওখানে টুরিস্ সেণ্টার করবেন। আর পূর্তমন্ত্রী বলেছিল, রাস্তা করে দেবে না। আবার আর্কেওলজিকাল সার্ভে ওটাকে সংরক্ষিত এলাকা করে রেখেছে। এসব কারণেই হয় নি। যাকগে! শুনুন, বনজ দ্রব্য আদিবাসী সরাসরি বেচবে বাজারে, বা আমাদের কাছে, এ লড়াই এ অধম তিনবার করেছে। আর করে না।

—না, খুব মুশকিল।

—আঠারো বছর চাকরি, আঠারো বছর ধরেই বিট অফিসার। আর কি জানেন? সরকারী নীতি যা বলে, সে কাজ করলে সরকার খুশি হয় না। পরিবারের সঙ্গে লড়াইয়ের সব মদত তো কৌরাররা পায়।

—এর···কোন উপায় নেই?

—যারা মার খাচ্ছে, তার কোন উপায় বের করুক। নরা-খেড়ির লোকরা তো খানিক করেছে।

—সরকারী নীতি সরকার চায় না?

—আরে! সরকার কাকে দেখবে? একটা মাতাল জানোয়ারকে

আপনি লকাপে রাখলেন। সে এমেলের শালা, তাই আপনাকে এখানে বদলি করে শিক্ষা দিল। আমি তো পানিশমেণ্ট পোস্টিংই পাই। কি করব?

—সত্যি!

—পালামৌ জুড়ে বন কাটা হচ্ছে। জমিদার-ডিপাটমেন-ব্যবসায়ী গাছ নিয়ে যাচ্ছে। "ফরেস্ ফর ট্রাইবল্স!" ওরা দশমাইল হেঁটে শুকনো লকড়ি এনে বেচছে আট-দশ টাকায়। দেখে যাচ্ছি। ফরেসগার্ডরা বোঝা পিছু দু-এক টাকা নিচ্ছে। দেখে যাচ্ছি। ভাববেন না, বসে বেতন নিই। ওটা কি দেখছেন, অত বড় জায়গাটা?

—নার্সারি।

—হ্যাঁ। চারা বানাই, বনে লাগাই, যে চায় তাকে দিই। মাঝে-মাঝেই ভি. আই. পি-রা এসে বহোত্ ধুমধাড়াক্কা করে চারা লাগান, আমিও দিই। এই তো!

—আমি চলি, মাঝে মাঝে আসব।

—আসবেন। থানায় গাছ লাগাবেন তো বলবেন, চারা দিয়ে দেব। ফরেস-আপিস যত গাছ লাগাচ্ছে, তার ডবল গাছ কাটছে এই সব আদমখোররা। কি ভেবে চাকরি নিলাম, কি হয়ে গেল!

—অন্য কাজে যেতে পারতেন।

—ফরেস আমার ভাল লাগে। আসবেন।

কপিল শ্রীবাস্তবের কথা ভাবতে ভাবতে ও. সি. থানায় ফেরে। লারাতুতে এমন একজন লোক আছে তা জানাই ছিল না। শিক্ষিত লোক মনে হল, টেবিলে ইংরিজি খবরের কাগজ ছিল, ঘরে, নেপথ্যে, রেডিওতে হিন্দী ক্লাসিকাল গান শুনছিল কেউ।

হেডসিপাহী বলে, ওই শ্রীবাস্তব? ও আগেও এখানে ছিল, আর লারাতুতে তখন থানা হয় নি। হজৌর, ওর কাছে কোনো ভালো লোক যায় না কখনো।

—কেন?

হেডসিপাহী মাথা নাড়ে বারবার।

—সে বহোত হি তুখ্‌কে বাত্‌। বাড়িতে সব ডাক্তার, অ্যাড-ভোকেট, সরকারী অফসার। গয়া টাউনে ওদের চেনে-না কে? সে বাড়ির ছেলে হয়ে, ছি ছি ছি, বিধবাকে বিয়ে করল, ভাবতে পারেন? বিট অফিসার! এর চেয়ে ভাল চাকরি ওর মিললই না। তবে ভগবান আছেন! তাই ছেলেমেয়ে হয় নি, আর ও নিজেও চাকরিতে বেশ উন্নতি করতে পারল না।

—বেজাত বিয়ে করেছে?

—হোক না স্বজাতি, বিধবা তো!

বিধবা! ও. সি-র আজন্ম সংস্কার বলে "ছি ছি!"

ও. সি. বলেন, যাক গে, পরের কথায় কাজ কি?

—আবার গরম দেখায় কত! ঘুষ খাব না, ফরেসের জিনিস নিয়ে ব্যবসা করব না! ছেড়ে দিন ওর কথা।

ও. সি. বোঝে, হেডসিপাহী তাকে ছেলেমানুষ মনে করে ও অভিভাবকত্ব ফলায়।

থানায় ফেরে যখন তখন অবধি দিনটা ভাল কাটে।

॥ এগারো ॥

বেলা তিনটে নাগাদ দিনটি বিস্ফোরিত হয়, যখন রুক্ষ চুল শূন্যে উড়িয়ে ছুটে এসে তেত্‌রি আছড়ে পড়ে থানাতে। বলে শীগগির চলো দারোগাসায়েব, তশীলদাররা আমাদের মারতে লেগেছে, আওরতদের, আর বোরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। হাজারী ভোগভাইনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এবার নয়া-খেড়ি জ্বালাবে বলছে।

হেডসিপাহী বলে, যাবেন না হুজৌর!

—ডাকুন, সিপাহীদের ডাকুন, এটা ল-অ্যান্‌-অর্ডার-এর ব্যাপার।

— সবাই গেলে···

—চলুন, চলুন, ভজন থাকবে।

তেত্‌রি বলে, জঙ্গলের মুখেই ধরেছে আমাদের। আওরতদের গায়ে হাত দেয়, এরা কেমন মরদ? নিমার হাত ভেঙে দিয়েছে। হায়

দারোগাসাহেব! আমরা কেমন করে এদের হাত থেকে বাঁচব, তা ব্যবস্থা করুন।

হেডসিপাহী বলে, বাস, বাস করো তেত্‌রি! তোমার গলা কত উঁচু, কথা কত খারাপ, হাত কেমন চলে তা সবাই জানে! এখন হজৌরের মাথা খারাপ কোর না। কা তু লীডার বন গয়ি তেত্‌রি? ওদিন তোর নামে রিপোর্ট লিখালি, আজও তুই এসেছিস?

—তুই জানিস না কেন? জানোয়ারগুলো বুড়ীদের ছেড়ে দেয় না, জওয়ানী বিটিয়াদের আসতে দেবে কোন ভরসায়? কাহে ন রিপোর্ট লিখোয়াই হম? আমি একটা ছিটিজেন, হাঁ! যখন ভোট প্রচারে এল, তখন কানকাটা মোহর সিং বলে নি, তুমি ছিটিজেন, তুমি ভোট দেবে?

—ছি ছি, "কানকাটা" কি?

—তার কানের মাকড়ি ধরে টানে নি তশীলদার? কান কেটে যায় নি তার?

ও. সি. বলে, ভোট দিয়েছিলে?

—জরুর! ট্রাকে চেপে গেলাম, ডবল রোটি খেলাম, দুটো টাকা পেলাম, ভোট দিয়ে দিলাম।

নয়া-খেড়ি পাশে রেখে ঘুরে ওরা সংরক্ষিত বলে ঢোকে। একটি সিধা গাছের নিচে অনেক মানুষের ভিড় তশীলদার ও তার সঙ্গীরা বসে আছে, নিরস্ত্র। ওদের ঘিরে বহু স্ত্রী পুরুষের ভিড়।

—পুলিশ! পুলিশ!

ভক্ত খারোয়ার পাঁচটি লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠির মাথা লোহায় বাঁধানো। মারণাস্ত্র। একটি মেয়ে শুয়ে আছে। তার মাথা রক্তাক্ত, তাতে গামছা বাঁধা। আরেকটি মেয়ের হাত ফুলে উঠেছে নিদারুণ। একটি শিশু কেঁদে চলেছে। সামনে মহুয়ার পাঁজা, ছিটানো।

—কি হয়েছে?

সবাই কথা বলে ওঠে।

—একজন বলো।

কোসিলা উঠে আসে। বলে, আমি বলছি। আমরা, মেয়েরা, সারাদিন মৌয়া কুড়িয়ে এখানে ঢেলেছি। আর মরদরা বোরা আনতে গেছে, বোরায় উঠাবে, নিয়ে যাব।

আঙুল তুলে হিংস্র গলায় বলে, ওই! ওই তশীলদার আর ওরা লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখছে আমরা আওরত! দমাদম লাঠি ঘুরাচ্ছে। হাজারীর মাথা ফেটে গেল, নিমার ডান হাত ভেঙে গেল। আমাদের পিঠ দেখ, হাত দেখ। আর বলল, কোনো কুত্তী মৌয়াতে হাত দিবি না। রাগে পাগল হয়ে মৌয়া ঠেলে ঠেলে ফেলে দিল।

তশীলদার বলে, আওরত! সবাই হাঁসলি ঘুরাচ্ছিল। আমার পায়ে কোপ মেরেছে।

কোসিলা বলল, এখন তো হাঁসলি আনতেই হয় রে কুত্তা!

—মুখ ভেঙে দেব কোসিলা।

—রাজপুতের বাচ্চা আমাদের কুত্তী বলবে, খারোয়ার হয়ে আমরা ছেড়ে দেব? কুত্তা তো বটেই। নইলে কুত্তীদের কাছে আসিস কেন? আর ওই ভীম সিং আর মোহন যাদব বলেছে, তোদের উটিয়ে লিয়ে যাব। দেখ দারোগা সাহেব! আমরা খেড়িতে এসব কথা শুনিনি। সরকারী জমিনে বাস করব, সরকারী জঙ্গলে মৌয়া উঠাব। আমাদের উপর কোন হকে এরা জুলুম করছে?

ও. সি. বলে, এত লোক?

ভক্ত খারোয়ার বলে, তেত্রি মৌসি আমাদের জানিয়ে দিয়ে থানা চলে গেল। আমরা এসে না পড়লে…এই দেখুন ওদের লাঠি।

তশীলদার বলল, তোমরাও মেরেছ।

—মেরে ফেলিনি এই তোমাদের সৌভাগ্য।

—বাপ রে, মার!

—তোমাদের লাঠি দিয়েই মেরে দেখলাম, তোমরা বাপরে বাপ বলছিলে। মেয়েদের কোলে বাচ্চা থাকলে তারা বাঁচত?

—চল সবাই, থানায় চলো।

তশীলদার বলে, আমরাও যাব ?

—আপনারাই তো প্রধান ব্যক্তি। সরকারী…

—সরকারী কানুন এখানে চলে না দারোগাজী! মৌয়াতে হক কৌয়ারের।

—আপনারা কৌয়ারের নোকর, আমি সরকারী নোকর। আমাকে তো নোকরি রাখতে হবে। তাই নিয়মও মানতে হবে। রিপোর্ট আপনারা যদি না দেন, তাহলে এদের রিপোর্টই লিখব। আর, এদের জখম যেমন, সরকারী হাসপাতালেও পাঠাতে হবে।

—আপনার জান থাকবে ?

ও. সি. স্বভাবোচিত সরল হেসে বলল, জান কার চিরদিন থাকে তশীলদারজী ? ওই লাঠি আপনার মাথায় পড়লে, আপনার ট্রাক-সার্ভিস আর স-মিল কে ভোগ করবে ভেবে দেখেছেন ? মোহন যাদব ও ভীম সিং তশীলদারকে বলে, এ সব কি শুনছি ?

তশীলদার ছটফট করে, উঠতে যায়। ভীম সিং ওকে বসিয়ে দেয়।

—কেন, এত ব্যস্ত কেন ?

ভক্ত খারোয়ার বলে, ও সব কথা থাকুক। চলুন, থানায় চলুন। আমরা গাড়ি আনি। মেয়েরা তো হেঁটে যেতে পারবে না।

—হ্যাঁ, থানায় চলুন। আমি বলি, আপনারা একটু বুঝে চলুন। থানায় বসে মিটমাট করে নিতে পারেন।

হ্যাঁ…থানা…চলুন…

ভীম সিং বলে, কিসের মিটমাট ? এদেরকে উচ্ছেদ করে ছাড়ব। আর…

তশীলদারের দিকে তাকিয়ে বলে, ওঃ! তশীলদার সিং। টারাক! স-মিল! কৌয়ার তো জানবেন। আব তেরা কা হোগা কালিয়া ?

তশীলদার উঠে দাঁড়ায়। ও. সি. কে বলে, থানায় কি দরকার ? আমরা আছি, ওরা আছে, কথাবার্তা হয়ে যাক।

মোহন যাদব বলে, কখনো নয়।

তশীলদার বলে, আমি তোমাদের সঙ্গে আসিনি, তোমরা আমার

সঙ্গে এসেছে। কৌয়ারের সঙ্গে কাজ করতে পেতে কোনদিন? আমি না নিয়ে এলে সেদিন মোহন তো শেষ হয়ে যেত, ওর ওপর পুলিশের খার ছিল। আর গজন সিং···

তেত্‌রি বলে, ছাড়ো তোমাদের কথা!

—চুপ যা তেত্‌রি। ভালো চাস তুই নয়া-খেড়ির? তবে চুপ যা! দারোগাসাহেব, এ কথা এখানেই মিটান।

কোসিলা বলে, কেন? আমরা কেস করব।

তশীলদার আস্তে, থেমে থেমে বলে, খেড়ি-বাঁধে কিসে জিতেছিলি তোরা, তাতে কেসের উপর বহুত ভরোসা কোসিলা? এ জিলাতে অমন ঘটনা বারবার ঘটবে না। রাজপুত বিরাদরি আছে, তারা দেখবে অছুত আদিবাসী যেন দলিত থাকে!

ও. সি. বলে, আমি তেত্‌রিদের বলছি, বেইজ্জতি হয়েছে, জুলুম হয়েছে।

গজন সিং বলে, আজব বাত! আদিবাসী মেয়েকে পিটালে তার ইজ্জত চলে যায়?

নিমা উঠে দাঁড়ায় ও গজন সিংয়ের দিকে থুথু ফেলে বলে, চলে যান দারোগাসাহেব! এদের লাঠি আমরা কেড়ে নিয়েছি, আমরা দলে অনেক ভারি। পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলব হারামিদের, তারপর আমাদের জেলে দিবেন, ফাঁসি দিবেন, গুলি চালাবেন, ঘর জ্বালাবেন!

ও. সি, এতক্ষণে বিদ্যুতের শক খায়। এদের মধ্যে ক্রোধের আণ্ডারকারেন্ট বইছে। এরা যদি ব্যাটারি হয় তবে প্রত্যেকটি ব্যাটারি চার্জ হয়ে আছে।

সে বলে, ঝটপট করো।

তেত্‌রি বলে, আমরা পোরমিট নিয়ে সরকারা নিয়মে সরকারী জঙ্গল থেকে মৌয়া কুড়াব। কি রে বিটিয়ারা, কুড়াব না?

ওদের পুরুষরা নীরব, ওরা দর্শক মাত্র।

মেয়েরা বলে, জরুর কুড়াব।

—আমরা সে মৌয়া যে বেশি টাকা দেবে তাকে বেচব।

—জরুর বেচব।

—তশীলদাররা জুলুম উঠালে আমরা থানাকে জানাব, ফরেস আপিসে জানাব, আর কোনো ব্যবস্থা না করলে মারব, হ্যাঁ মারব!

—তশীলদার শুকনো ঠোঁট চেটে বলে, মৌয়া কুড়াতে এসেছে সব হাঁসলি হাতে।

—জানোয়ারদের ভয়ে। আয়! দারোগাবাবু! আমরা না লারাতুমহলের প্রজা, না কামিয়া। আমরা কেন ওদের চোটপাট সইতে যাব?

তশীলদার বলে, ঠিক আছে।

ও. সি. বলে, সব মেনে নিচ্ছেন?

—বললাম তো, ঠিক আছে।

—লাঠি দিয়ে দাও।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে কোসিলা বলে, দেব না। কুড়িয়ে নিতে হবে।

ভক্ত খারোয়ার লাঠিগুলো ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে। তেত্‌রি বলে, যাও যাও তশীলদার শিং। তশীলদার! হায় হায়! ভীম সিং হায় হায়! ভাগো, ভাগো সবাই।

"হায় হায়" মানে "ধিক ধিক" বা "ছি ছি।"

তশীলদার বলে যায়, মৌয়ার মামলা বহোত খরচা করাবে তোদের, তেত্‌রি!

—যা যা! তেত্‌রি জানের মায়া করে না!

ও. সি. মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে। কোসিলা বলে, আপনার সামনে কথা হল, এবার আপনারও দায়িত্ব।

—তোমরা···যাকে বলে···শান্তিভঙ্গ ক'র না।

কোসিলা হাসে। বলে, শান্তি কোথায় দারোগাসাহেব? আর-শান্তি তো আমরা ভাঙি নি।

ওদের মরদরা বয়েলগাড়ি আনে। নিমা ও হাজারীকে তোলা হয়।

—স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাও, আমি লিখে দিচ্ছি।

ও. সি. চলে যান। এরা চেয়ে থাকে। তারপর তেত্‌রি বলে, তোরা তাড়াতাড়ি কর্‌। উঠা মৌয়া। আমি যাচ্ছি।

—যাও, তুমি যাও।

পুরানা কিল্লায় পৌছে তেত্‌রি বলে, ববুয়া! আজ রাতে ওরা নয়া-খেড়ি জ্বালাবে।

—ওখানে কি হল?

তেত্‌রি সব বলে।

বিন্দা সিং বলে, কপিল কি ভাবছ? দেখ, নারী মুক্তি দল কাজ করছে।

—বিটবাবু, কা তুম ইধর?

বিন্দা বলে, কলেজী দোস্ত্‌। আর···পুরানা দোস্ত্‌।

কপিল শ্রীবাস্তব বলে, তেত্‌রি?

—না বাবু! আমরা শপথ খেয়েছি।

—বিন্দা! আমি তোমাকে বলছি, পথটা দুরদুর্গম হবে, কিন্তু তোমরা মাইল তিনেক দূরে মোহনপুরে কর্তার সিং বাটরার আড়তে যোগাযোগ কর। ওকে আমার নাম বোল, ও মৌয়া-ধুনা-লাক্ষার বড় আড়তদার। রাজপুত বিরাদরি ওকে ঘাঁটায় না, বড় রেল কনট্রাক্টার। সেখানে বেশি দাম পাবে কিছু। আর! মৌয়ার ব্যাপারটা ওর ওখান থেকেই ছড়াবে খবর। অন্যরাও জানবে, কিছুটা নড়বে জগদ্দল চাকা।

—তাই হোক। ইস্তাহারও বিলাব।

—আমার সঙ্গে পরিচয়টা গোপন রেখো।

—সরস্বতী কেমন আছে?

—ভালো। ইস্তাহার কেমন লিখছে?

—খুব ভালো।

—এবার আর বদলি নয়, চাকরিটাই যাবে। আর শোনো, ওরা কিন্তু সন্ধ্যা হলেই জঙ্গলের পথে আসবে। নয়া-খেড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ালি না করলে কৌয়ারের ঘুম হবে না

—না, আমরা তৈরি হচ্ছি। তুমি যেতে পারবে তো?

—ভুলে যেও না, এ জঙ্গলটা বলতে গেলে আমার তৈরি। আর বিটবাবু জঙ্গলে তো হাঁটেই।

কপিল চলে যায়। বিন্দা বলে, মৌসি!

—হাঁ ববুয়া, আমিও যাই।

—গ্রামে যেন পাহারা থাকে, রাত ভোর।

—কে ঘুমাবে?

—কৌয়ার কি নিজে আসবে?

—নিজে সে কমই আসে।

—ছেলে আসবে?

—ছেলে এখনো মাঠে নামে নি। সে সিনেমা হল বানাবে, বাবার কাছে টাকা চায়।

—খবরের জাহাজ তুমি!

—না হলে চলে?

জেত্রিও জঙ্গলের পথে মিলিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে জঙ্গলের ওপর নেমে আসে কিসের যেন আবরণ। ঝাঁক ঝাঁক পাখি ফেরে বাসায়। বাতাসে মহুয়ার গন্ধ। সব যেন শান্ত, ঘুম ঘুম।

অনল বলে, কপিল বন্ধু?

—হ্যাঁ, কপিল···সরস্বতী···

—সরকারী নোকরিতে গেল?

—বিয়ে করবে, কাজ দরকার ছিল। বিহার তো! বিধবা মেয়ে তায় লতায় পাতায় আত্মীয়, তাকেই বিয়ে! সেই থেকে একের'পর এক পানিশমেণ্ট পোস্টিং হচ্চে।

—বিশ্বাসী তো?

—আমি তো কয়েক বছর ধরেই বিশ্বাস করে আসছি। তাতে ঠকিনি এখনো! চলো!

পরবল বিরজিয়া, বিন্দা সিং, অনল তলোয়ার ও বিরল ভোগতা বেরিয়ে যায়। খাকা-সবুজ শার্ট ও ফুলপ্যাণ্ট, কাঁধে ঝোলানো বন্দুক।

লারাতু থেকে আসবার পথ একটাই। তশীলদাররা সিগ্নল ফাইলে এগোচ্ছিল। কৌয়ার বলেছেন, নয়া-খেড়ি জ্বালাবে, তবে মুখ দেখাবে।

কৌয়ারমহল থেকে ওরা বেরিয়ে যাবার পর, কৌয়ার অমরজিৎকে ডেকেছিলেন।

—কি, তুমি সিনেমা বানাতে চাও?

—হ্যাঁ, পিতাজী।

—এই জঙ্গলে?

—না, টাউনে।

—টাউনে তো হল আছে।

—এখানে নয়, ধানবাদে।

—ধানবাদে!

—হাঁ, আর আমি ফিনানসিয়ারও পেয়ে যাব।

—কে?

—চন্দ্রভান জোগাড় করে ফেলেছে।

—তোমার শালা চন্দ্রভান?

—হ্যাঁ, পিতাজী। ও তো ধানবাদেই থাকছে এখন

—ও কাজ কোর না।

—আমি লারাতু এস্টেট নিয়ে পড়ে থাকতে পারব না, সে তো আগেই বলেছি।

—সেটা কে দেখবে?

—আমার দিন আসুক, আমি দেখব। সব মডার্ন করে দেব। এত সেকেলে চালে আমার চলবে না।

—আমার কথা ভাবলে না।

অমরজিৎ খুব হিসাব করে করে বলে, আপনার তো আমাকে কোনো দরকার নেই। আমি কি দেখব? তশীলদার সিং থাকতে আমার তো কোন দরকার নেই। সেই তো সব জানে, আপনার বিশ্বাসী লোক।

—মুখ সামলে অমরজিৎ ?

—সত্যি কথা আপনি শুনতে পারেন না কেন ?

—তশীলদার আমার কর্মচারী !

—আপনাদের একেকটা কাজ নিয়ে টাউনে কত কথা হয় তা জানেন ?

—বিরাদরিতে হয় না। কে আমাকে সমালোচনা করবে ? লারাতু এস্টেট সবচেয়ে বড়।

—আপনি আর আপনারা ! আপনাদের নিয়েই বিরাদরি চলবে ? আমাদের জেনারেশনেও বিরাদরি আছে। আর আমরা চাইনা ওই সব ভঁইস, ক্ষেতী, মৌয়া আর কামিয়া নিয়ে একেকটা কেচ্ছা হোক।

কৌয়ার বলেন, এই কথা !

—নয়তো কি ? তশীলদার যা বলবে, তাই ! সে কি করে, তার খবর রাখেন ?

—রাখি না ?

—না, পিতাজী, না।

কৌয়ার ছড়িটা তুলে দেখান ছেলের দিকে, এই পোশাক ! ওই জুতো ! ওই গাড়ি ! তোমার লাফাঙ্গাদের জন্য মোটরবাইক ! সব আসছে ওই জঙ্গল-জমিন-ভঁইসা আর কামিয়া থেকে।

—আমি এ সব চাই না।

—তুমি, না ধরমবীরের মেয়ে ?

—আমি যা বলব, ও তাই বলবে। কি বুঝবেন আপনি ! আপনি বুঝবেন না। আমার চেয়ে, আমার চেয়ে ওই তশীলদার আপনার বেশি আপন লোক। যাক গে, কথায় কথা বাড়ে, আমি চললাম।

—তোমার মা-র খবরটবর নাও ?

—প্রত্যেকদিন। এবার শীতকালে মাকে নিয়ে প্রয়াগ—বিশ্বনাথ-গয়াজী ঘুরে আসব ইচ্ছা আছে। আমরা সকলেই যাব।

—সে দেখা যাবে। ঘর থেকে বাগানে যায় না···

অমরজিৎ আর কথা বাড়ায় না।

কৌয়ার বসে থাকেন তাঁর কেদারায়। ভীমের ভাইপো রোহিত তাঁর পা দাবায়। মন চঞ্চল হচ্ছে, মন ক্ষুধার্ত। নয়া-খেড়ি জ্বলবে, দেওয়ালি হবে। কোসিলা খারোয়ারকে তুলে আনবে তশীলদার, অনেকদিন শিকার খেলা হয় নি। অমরজিৎও বুঝবে একদিন, মানুষ শিকারে কত আনন্দ! কোসিলা খারোয়ার!

তশীলদার কত দেরি করবে?

—রোহিত!

—মালিক!

—চাঁদকো ভেজ দে।

—জী মালিক!

আসুক, চাঁদ আসুক: মেপে ঢেলে দিক এক পো। রাঁচির চিকিৎসক মানা করেছেন, তবু সব নিষেধ মানা সব সময়ে কঠিন। কৌয়ার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। তশীলদার! অনেক, অনেক কাল পরে শিকার খেলবেন কৌয়ার।

তশীলদার, ভীম, জমাদার, মোহন ও গজন কেড্‌সে শুকনো পাতা দলে চলে যাচ্ছিল। তশীলদার ভাবছিল, একা ভীমকে সরিয়ে দিলেই চলবে। কৌয়ারকে ও ঠিকই জানাবে যে তশীলদার কাঠচেরাই কারখানা খুলেছে, ট্রাকের সার্ভিসে অংশীদার হতে চলেছে।

ও. সি-কে কি করে সরাবে?

লালবদনকে বাঁচিয়ে রাখা তো স্বস্বার্থেই দরকার। ও. সি. আর ভীমা!

কৌয়ার, নিজস্বার্থে ওদের সরাতে পারেন। তশীলদার কি করে পারবে?

ভীম ঈষৎ হাসে ও বলে, আজ জমবে।

খুনজখম দরকারে করা যায়, অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হিসেবে, কিন্তু হত্যাতে উল্লাস হওয়াটা তশীলদারের পছন্দ নয়! ভীমটা অত্যাচারে আনন্দ পায়।

—এবার নামতে হবে, তারপরই নয়া-খেড়ি।

তশীলদারের দুঃখ হয়। বড় সুন্দর ঘরগুলো তুলেছিল ওরা। কি কুয়ো কেটেছে, কত জল তাতে। খুবই সুন্দর গ্রাম। সব জলে যাবে নিমেষে, বড় দুঃখ।

কোসিলা, কোসিলা, কোসিলাই কি থাকবে? এখন হাওয়া লেগেছে সব, মালিকের ভোগে গেলে নাকি ইজ্জত চলে যায়। ইজ্জত যাবে তো বর্ণহিন্দুর, রাজপুতের। এদের ইজ্জত আছে বলেই জানত না তশীলদার। কত কামিয়া মেয়েকে, কত বছর ধরে কৌয়ারের জন্যে··· অছুত — আদিবাসী মেয়েদের কৌয়ার চিড়িয়াখানার কাছের চত্বরে নিয়ে যেতেন। আলো নিভিয়ে ওদের ভোগ করা নিয়ম, ওই চত্বরে তো বাতি নেই। বাঘের গর্জনে মেয়েগুলো ভয়ে অসাড় হয়ে যেত। কৌয়ার তো একবারের পর কাউকে দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখতেন না।

কয়েকজন চেঁচাত, বেয়াড়াপনা করত।

তারা বাঘের পেটে যেত।

বরজু সব জানত, বরজু। হঠাৎ তশীলদারের বরজুর কথা মনে পড়ল কেন? তারপরে তো অনেককাল কেটে গেছে। কি নাম ছিল মেয়েটার?

—কুনারী ভুঁইন।

কে বলল? তশীলদার চমকে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকে ধাক্কা লাগল তশীলদারের, পড়ে গেল ও।

—কা হুয়া?

ভীম তার ওপরেই পড়ল।

মোহন বলল, তার! গাছ থেকে গাছে তার!

—তার?

টর্চের আলো পড়ল মুখে, নিভেও গেল। পিছন থেকে গলা জাপটে ধরল কে?

মোহন কেরোসিনের শিশি আর মশাল ফেলে দিয়ে দৌড়তে চেষ্টা করল।

—অত সোজা নয়, মোহন যাদব !

অচেনা মুখ, খাকী-সবুজ পোশাক, হাতে বন্দুক।

—ঝটপট বন্দুক কাড়ো ওদের, আমি ওদের নিশানবন্দী রেখেছি। একটু নড়লেই…

—তোমরা কে?

—শোষিত্ মুক্তি দল।

—তোমরা…কি করবে আমাদের?

চাপাগলায় উত্তর আসে, কোনো কথা নয়।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?

উত্তরে মোহনের মুখে বন্দুকের নল ঠেকে। তশীলদারের হাঁটু ভেঙে আসে, হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত নেমে যায়। উগ্রপন্থী! এদের কথাতেই লালবদন বেশি দামে মৌয়া কিনছে। যাদের ভয়ে ও বলতে পারে নি কিছু।

টানতে টানতে তশীলদারদের ওরা নিয়ে চলে জঙ্গলের গহীন থেকে গহীনে। ওরা যে কোথায়, তা বুঝতে পারে না কিছু। একটা পাথরের গায়ে ওদের ধাক্কা মেরে দাঁড় করায় এরা।

তারার আলোয় কতটুকু আলো আর! এদের প্রত্যেকের নাকের নিচে রুমাল বাঁধা।

—আমরা শোষিত্ মুক্তি দল। জনতার স্বার্থে কাজ করি।

—না মারিও মালিক!

—মালিক নই আমরা জনতা আমাদের মালিক। আমাদের আদালতে রায় বেরিয়েছে, তোমাদের শাস্তি হবে।

—না মারিও সরকার!

ওরা নিজেরা কি কথা বলে। তারপর ওদের বন্দুকই তোলে ওদের দিকে।

—দেখ কৌয়ারের কুত্তারা! বন্দুকের নল ঘুরে গেলে বুকের মধ্যে কেমন লাগে।

তশীলদার বলে, আমি…আমি তোমাদের টাকা দেব

ভীম বন্ধ ও অবোধ অসহায়তায় মুখ ওপর পানে তোলে, চেঁচাবে।

খট্ খট্ খট্ খট্ গুলির শব্দ। ওরা ঘুরে পড়ে।

বিন্দা সিং বলে, ওদের বন্দুক, ওদের গুলি।

—এখন?

—ঢালে গড়িয়ে দাও।

—গাছে আটকে যাবে।

—গড়িয়ে দাও। নিচে খাদান। দাঁড়াও, পেট একটু চিরে পোড়া মবিল ঢেলে দাও। জাবনে গন্ধ উঠবে না। ওপর দিয়ে জল তো বয়েই যাবে।

—ওদের বন্দুকগুলো?

—তিনটে রাইফেল, লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু ওগুলোও গড়িয়ে দাও। পুলিশ ধোঁকা খাক।

পান্না খারোয়ার বলল, কাজ ভাল হল, কিন্তু আমরাও ধরা পড়ব। তবে রাইফেল নষ্ট করতে পারব না।

—তোমরা নয়া-খেড়িতে রাখতে পারবে লুকিয়ে?

—পারব।

—দেখ। কেরোসিনের টিন আর মশাল ফেলে দাও ঘাসে। আমরাও ফিরব এবার। এ বিষয়ে কোন কথা নয় পান্না, একটা কথাও নয়।

—এবার বোধহয় আমাদের ধরবে।

—সে তো ধরবেই। লড়াইয়ে নামলে···

—চলো।

তশীলদাররা ফেরে না, ফেরে না। রাত কেটে ভোর হয়, সূর্য ওঠে। নিচু পাহাড়ের ঢালে খাদানের গভীরে যুগান্তের পচা পাতা ও বর্ষার জলে পড়ে থাকে তশীলদাররা। লারাতুর মহল থেকে নয়া-খেড়িতে যাবার পথ তো একটাই। নয়া-খেড়িতে যে ওরা যায়নি তা তো বোঝাই যায়, যখন ভজন সিং, মোতিহার যাদব, তিলক সিং ও

শেরদিল সিং নয়া-খেড়িতে লোকজনকে বহু নাকাল করেও ওদের খবর পায় না। তেত্‌রি হাত নেড়ে বলে, হ্যাঁ তারা এসেছিল। দারোগা-সাহেব, হেডসিপাহী সবাই দেখেছে! দারোগাসাহেবের সামনে তারা চলেও গেছে। আসবে না কেন? এসেছিল, পিটাই করেছিল মেয়েদের। নইলে নিমা আর হাজারী অসপাতালে পড়ে আছে কেন?

—ও ঘরে কি আছে, ঘর বন্ধ কেন?

—আমরা মৌয়া রেখেছি।

পথটি দেখতে দেখতে যায় ওরা। না, কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

কৌয়ার ফেটে পড়েন, পাঁচটা লোক কোথায় যেতে পারে? তোরা থাকতে আমি যাব খুঁজতে?

— কোথায় খুঁজব?

—সে আমি বলে দেব? লালবদনের কাছে যা! কোথায় যাবে? কোথায় যেতে পারে?

লালবদন নিশ্বাস ফেলে মস্ত বড়। বলে, আমি টাউনে ছিলাম, প্রথম বাসে ফিরলাম। আমি তো দেখিনি।

ক্রোধোন্মত্ত কৌয়ার গাড়ি বের করতে বলেন। ও. সি.! ওই ও. সি. সব জানবে।

—পুলিশ কার সাহারা করতে এসেছে? আমার, না নয়া-খেড়ির?

—কেন কৌয়ারসাহেব? পুলিশ পাবলিকের চাকর!

—আমার নয়?

—পাবলিক তো সকলেই। কি সেবা করতে পারি আপনার বলুন?

—তশীলদার, ভীম, মোহন, জমাদার আর গজন কোথায়?

—আমি তো তাদের বিকেলের পর আর দেখিনি। তারা তো চলে গেল।

—মৌয়ার মামলায় আপনি গ্রামের পক্ষ নিলেন?

—আমি কারো পক্ষ নিইনি কৌয়ারসাহেব। মৌয়া উঠাচ্ছিল মেয়েরা, আপনার লোকেরা গিয়ে ওদের মারপিট করে। দুটো মেয়ে

হাসপাতালে আছে। তারপর ওরা নিজেরাই মিটমাট করে নেয়। আপনার লোকরা তো চলে গেল।

—আপনি সত্যি কথা বলছেন না। আমি সুপারের কাছে যাব।

—সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলেছি। বিশ্বাস করুন, বা না করুন।

—তশীলদারকে কি বলেছেন, ট্রাক সার্ভিস, স-মিল, ভীম বলতে যাচ্ছিল, তা শুনিনি তখন।

ও. সি. এখন কৌয়ারের সামনে। কৌয়ারের পিছন থেকে হেডসিপাহী ও. সি.র দিকে তাকায়। তার চোখে ওয়ার্নিং।

ও. সি. জীবনে প্রথম অভিনয় করে এবং খারাপ অভিনয় করে না। সে বলে, ও! সেই কথা!

ঈষৎ হেসে বলে, তশীলদার নিজেই আমাকে বলছিলেন কাঠচেরাই কল, ট্রাক-সার্ভিস, সব করে ফেলবে লারাতু এস্টেটে। তাতে তিনিও থাকবেন। যে টাকা বাইরের লোক নিচ্ছে, তা এস্টেটে আসবে।

—কা! আপনারও কিছু অংশ থাকত না কি তাতে?

—না কৌয়ারসাহেব! আমি খুব সামান্য লোক, যা মাইনে পাই সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তবে দুঃখ কি, বাড়ির লোকজনকে তো আনতে পারি না এখানে। আপনি যদি কখনো দয়া করেন, কিছু ভাল কথা বলেন আমার সম্পর্কে। আমি হয়তো বদলি হতে পারি।

—আমি কায়স্থকে মদত দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, আপনিও আমায় মদত করুন।

—বলুন, কি করব?

—নয়া-খেড়ি জ্বালিয়ে দিন।

—আমি সামান্য লোক, আপনার তামাশার লোক নই।

—কুছ সংযোগ হ্যায় দারোগা।

—কি সংযোগ?

—বিকালে ওরা মেয়েদের হাতে জুতো খেয়ে ··

—কেউ জুতো মারে নি।

—অপমান তো হল, মিটমাট তো করল। আর কি জুতো খাবে! চারটে রাজপুত, একটা যাদব, কতকগুলো আদিবাসীর সঙ্গে মিটমাট করে চলে এল, আর দারোগা দাঁড়িয়ে দেখল ; হায় ধর্ম!

—ওঁরা তো নিজেই মিটমাট করলেন।

—সে তো শুনলাম। ধরম যুগ শেষ হয়ে গেছে কি? শেষই হয়ে গিয়ে থাকবে। এই সমাচার, এই দর্প ছোট জাতের, এ সবের কারণ কি জানেন?

—কি?

কৌয়ার দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটাকে ছড়ি মারেন।

—এহি ভিলাইতী সংবৎ। এ জন্যেই আমি বিক্রম সংবৎ বহাল রেখেছিলাম লারাতুতে। যাতে কেউ, কখনো ধর্মের শাসন না ভোলে। যাক গে! তশীলদাররা জুতো খেয়ে চলে এল, তো আমি বললাম, নয়া-খেড়ি জ্বালাবে, আমি খবর পাব, তারপর অন্য কথা।

—আপনি ওদের গ্রাম জ্বালাতে পাঠিয়েছিলেন?

—এটা কোনো বড় কথা নয়। ঝুঝার জ্বলেছে, খেড়া উজাড় হয়ে গেছে, নয়া-খেড়ি জ্বলবে এ আর তেমন কি বড় কথা?

ও. সি-র বুক এতক্ষণ ধড়ফড় করছিল। এবার সে নিজেকে শাসনে আনে।

—কেউ দোষ করলেও তার ঘর জ্বালানো আমার এক্তিয়ারে পড়ে না।

—জানতাম, পারবেন না।

দুজনেই চুপ। বিকেলে ওই ঘটনার পর তশীলদাররা নয়া-খেড়ি জ্বালাতে গিয়েছিল? ও. সি কাদের মধ্যে কাজ করতে এসেছে? ছিল ছোট শহরে, পালামৌয়ে ছোট শহর যেমন হয়। সেখান থেকে গেল মেজ শহরে, সেখানে দাঙ্গায় বস্তি, দোকান, বাড়ি জ্বলতে দেখেছে।

গ্রামকে ও. সি. গভীর শান্তির জায়গা ভেবেছিল। লারাতু

পানিশমেণ্ট পোস্টিং। ও ভেবেছিল, শহরের সবরকম শব্দ-আলো-দোকান বাজার-সিনেমা, এ সব মেলেনা এ টাই শাস্তি। কিন্তু এখন বুঝল তা নয়। কৌয়ারের অপ্রতিহত দাপট ও অত্যাচারের রাজত্বে কাজ করাই হল এক ভীষণ শাস্তি। ও. সি. মাথা নাড়ল।

—গ্রাম জ্বালাতে পারব না।

—আমার লোক তো জ্বালিয়ে দেবে।

—আমি তাতে বাধা দেব। অগ্নি-সংযোগ একটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

—ঠিক আছে। তবে আমার লোকদের খুঁজুন।

—আপনি বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।

—মুখে বলা যথেষ্ট নয়?

—নিয়ম, লিখে নেওয়া।

ও. সি. লিখতে থাকে! ··"নয়া খেড়ির লোকরা ওদের খুন করে গুম করেছে" শুনে কলম থামিয়ে বলে, আপনি ওদের মিসিং বলতে পারেন, খুন···গুম···এগুলো তো প্রমাণ হয় নি।

—যা মনে করেন, লিখে নিন। সরকারও ক্যালেণ্ডারে চলে গেছে, বিক্রম সংবৎ মানে না। রাজপুত বিরাদরিতে পুলিশ হবার যোগ্য লোক কি কম আছে? যাক গে, ঝটপট খোঁজ লাগান।

—লারাতু থেকে নয়া-খেড়ি যাবার পথ কি জঙ্গল দিয়ে?

—ওহি সমঝে নিন।

॥ বারো ॥

খোঁজ করার কাজটি সহজ হয় না, কেন না পাম্নারা পাথর গড়িয়ে দেয়। পচা পাতার স্তূপ।

লালবদন অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাকুল হয়ে বসে থাকে। তশীলদার ও ভীমদের ওরা নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে। খবর দেবে? খবর দেবে না? খবর দিলে পুলিশ ছেয়ে ফেলবে লারাতু! কৌয়ারের মস্তানরা হিন্দী সিনেমার ভাষায় ছান মারবে নয়া-খেড়ির ঘরে ঘরে। মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে, গ্রাম জ্বালাবে, লালবদন নিশ্বাস ফেলে।

কুনারী ভুঁইনের ঘটনার পর কৌয়ার খানিক নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য হয়।

আবার সে বিক্রম সংবতে ফিরে যাবে।

লালবদন হেডসিপাহীকে বলে, কা করে?

—কুছ্ ন করিও সাহু।

—কিছু করব না?

—আমি তো বলব কিছু জানি না।

—আমিই বা কি জানি?

—পুলিশ আর কৌয়ারকে মদত দেবে?

লালবদন মাথা নাড়ে।

—আমি কে, মদত দেবার?

—কি বা জানো তুমি, যে মদত দেবে? জানো কিছু?

—না সিপাইজী। তোমাদের খাওয়াই, বাঙ্কা থানাকে খাওয়াই, অনেক কষ্টে কারবার করি। কিন্তু ওরা গেল কোথায়?

—আমাকে বলে তবে গেছে?

—ওরা মৌয়া বেচতে আসছে না?

—সেদিন মারদাঙ্গার পর আর আসে?

—বহোত্ আফশোস। আর···তোমাকেই বলছি, আওরতকে খুন করে এত বদনামী হল। তারপরেও সেদিন ওরা মেয়েদের মারধোর করল, গাল দিল, উচিত হয় নি।

—শীলদারের কাঠচেরাই কলের কি হবে?

—সে তো তোমার নামে।

—হ্যাঁ, আমাকে বিশভাগ দেবে বলেছিল।

—ও যদি ফেরে, ও নেবে। যদি না ফেরে, তুমি মুফতে পেয়ে গেলে। তবে তখন চল্লিশ-ষাট! তোমার-আমার।

—কেন? তা ভেবে দেখ।

লালবদন গভীর অস্বস্তি বুকে নিয়ে বসে থাকে। সে রাজপুত নয়, ব্যবসা করতে এসেছে। ব্যবসা বিপন্ন হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

যাক গে, পুলিশ বুঝুক, অন্তরা বুঝুক, সে কিছু বলতে যাবে না।

তশীলদারদের খোঁজ চলতে থাকে, চলতে থাকে। আর ঝুঝার, নাড়া, কোকার, গাইবানী, চৈত্রপুর, মাকাপুরা, বড়াটোলি, গ্রাম থেকে গ্রাম, থানা ইস্তাহার ছড়িয়ে যায়—

—নারী মুক্তি দল গঠন করো।

—জঙ্গলের মৌয়া তুমি মালিক জমিদারকে বেচতে বাধ্য নও।

—সরকার তোমাকে অধিকার দিয়েছে, তুমি সরকারী জঙ্গল থেকে মৌয়া কুড়াও, জঙ্গলের জিনিসে তোমার অধিকার। যে তোমাকে সরকারী দাম দেবে, তাকে বেচবে।

—সরকারী জমিনের মৌয়া গাছে অধিকারও তোমার।

—মালিক-জমিদারদের অত্যাচার আর সহ্য কোর না।

—নারীমুক্তি দল গঠন করো!

কৌয়ারদের বিরাদরি এস. পি.-কে বলে, আপনি কিছু করবেন না?

—ওরা তো ঠিক লিখেছে। ওরা তো সরকারের জঙ্গলে, যে মৌয়া কুড়ায় তা ওরা বেচতে পারে। জঙ্গল-আইনও তাই বলছে। আপনারা জঙ্গলের জিনিসও লুটে নেন, তাই ওরা তাতে বাধা দিচ্ছে।

—বাঃ, চমৎকার! আর ওই "নারীমুক্তি বাহিনী" ব্যাপারটা কি?

—আপনারা সবাই বিক্রম সংবতে পড়ে আছেন, না খ্রীস্টপূর্ব কোনো সময়ে?

—ঠাট্টা করছেন?

—বিহারে সার্ভিস করব আর জমিদারদের সঙ্গে ঠাট্টা করব, অত বোকা পেয়েছেন আমাকে? আমরা তো সরকারের চাকর নই, আপনাদের চাকর। আপনাদের চটিয়ে কোন্ কমিশনার, কোন্ এস. পি. কোন জেলাকমিশনার পালামৌয়ে সার্ভিস করতে পেরেছে? বিহার সরকারের নাম আজ ভারতবর্ষে এত পচে গেছে, তাতে দুর্গন্ধ উঠে গেছে, সেও তো আপনাদের জন্যেই।

কৈলাস সিংয়ের ভাই বলে, আরে সাব! ভারতের চিন্তা ছাড়ুন, বিহারের কথা ছাড়ুন, পালামৌয়ের কথা ভাবুন।

—ওই তো কথা! পালামৌ আপনাদের কাছে বিশ্বভুবন!

—সহি বাত!

—কিন্তু আপনারা কি কোনো খবরই রাখেন না? মেয়েদের ব্যাপার এখন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার, বিহার সরকার, সর্বত্র নারীসমস্যা এখন টপ প্রায়োরিটি। আমিও রাজপুত। কিন্তু রূপ কানোয়ারের ঘটনার পর তো নারী প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের নামও পৃথিবীতে বহোত নেমে গেছে।

—কেন, নেমে গেছে কেন?

—আওরতকে জিন্দা জ্বালাই আমরা, দহেজের জন্যে জ্বালিয়ে দিই, এসব খবর কি বাইরে যায় না?

—আরে! বিদেশীরা ভারতের কথা কি বুঝবে? রূপ কানোয়ার তো "রাজপুত" নামকে পবিত্র করে দিয়েছে। আমরাও দেওরালায় টাকা পাঠিয়েছি। এমন মহাসতী যত হয়, ততই ভালো।

—পালামৌয়ে একটা মহাসতী বানিয়ে দেখুন, কি হয়।

—সাহেব! সতী কেউ কাউকে করতে পারে না। সতীশক্তি যার মধ্যে জাগে, তাকে কেউ থামাতে পারে না। এ আপনি বুঝবেন না।

—না, বুঝব না। আপনারা আসুন।

—নারী মুক্তি দল বিষয়ে কিছু করবেন না?

—কি করব? সবাই দল করছে, আওরতরাও করতে পারে।

—কি করে জানলেন ওরা উগ্রপন্থী নয়?

—ওরা উগ্রপন্থী, এমন প্রমাণ পেলে আমরাই অ্যাকশান নেব।

—দেখছি, আমাদেরও ফৌজ বানাতে হবে।

—ফৌজ তো আপনারা রাখেন!

কৌয়ার ভীষণ সন্দেহে বিস্ফোরক হয়ে বসে থাকে। তশীলদারদের খোঁজ মেলেনি, এর থেকে কি বুঝতে হবে? নিজস্ব রুটিন ভেঙে তিনি একদিন কপিল শ্রীবাস্তবের কাছে যান।

—আপনি জানেন কিছু ?

—কি জানব কৌয়ারসাহেব ?

—তশীলদাররা কোথায় গেল ?

—আমি কি জানব ? আপনি তো জানেন, আমি ডিউটি করি, কারো সঙ্গে মিশি না, কেউ আমার কাছে আসে না।

—জঙ্গলে তো ঘুরেন ?

—ওই তো চাকরি।

—কি হতে পারে ?

—কি করে বলব ? পুলিশ কিছু করছে না ?

—না। কিছুই না।

—জঙ্গলে সবটা ঘুরেছেন ?

—একদিনে নয়, কয়েকদিনে।

কৌয়ার তীব্র চোখে তাকাল।

—ওই মৌয়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে।

কপিল শ্রীবাস্তব চুপ।...

ওগুলো কি গাছ ? টেবিলে রেখেছেন ?

—শখ একটা। বন্সাই।

—বন্সাই ? তার মানে কি ?

—বড় গাছ, তাকে বড় হতে দিচ্ছি না। এটা ইমলি, এটা ছাতিম, এটা পিপল, আর এটা পলাশ।

—এতে কি লাভ ?

—একটা আনন্দ।

—কতদিন রেখেছেন ?

—ছাতিম গাছটা মাইথন থেকে এনেছিলাম, এটা...তা দশ বছর আছে।

—দুর্ভাগ্য আপনার পিছনেই তো ফিরবে। ছাতিম গাছ, আমরা শুনেছি শ্মশানের গাছ। ও গাছ কেউ ঘরে রাখে না।

—আমি তো জঙ্গলে লাগাচ্ছি খুব। লেগে যায় যদি, এ থেকে

ফরেস অনেক রেভিনিউ পাবে। ফুল, ছাল, আর আঠা কবিরাজরা কিনে ওষুধ বানায়। পাকা গাছের কাঠে ভালো ব্ল্যাকবোর্ড তৈরি হয়।

—বন্সাই থেকে কি হবে?

—রিটায়ার করে যাব, চাকরি ছেড়ে দেব, যদি বন্সাই বানাতে শিখে যাই। বন্সাই এখন একেকটা গাছ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়।

—হাসাবেন না। কোথায়?

—দিল্লী, বম্বে, বড় বড় শহরে।

—জঙ্গলে মৌয়া লাগাবেন না?

—কিছু লাগালাম। তবে বড় হতে সময় লাগে খুব বেশি।

— না, মৌয়া লাগাবেন। ওতে আমার রেভিনিউ।

কপিল চুপ করে থাকে।

—কা খচড়াই শুরু কিয়া য়ো নয়া-খেড়ি! এখন তো জব্দ। মৌয়া নিয়ে যে যার বসে আছে। লারাতুতে তো আর ঢুকছে না। এবার আমাকেই বেচবে ওরা।

—খবর পেয়েছে ওরা?

—খবর দেবে আপনার গার্ডরা, তাদের পাঠান।

—আমি মৌয়া কেনাবেচার ব্যাপারে ওদের যেতে বলতে পারি? রিপোর্ট হয়ে যাবে, আমি বদলি হয়ে যাব।

—বদলি হতে চান না?

—না। আপনি আছেন, খুব শান্তিতে আছি।

—সেটা মনে রাখলেই ভালো।

কিন্তু কৌয়ারসায়েবের মত অনেক মালিকই চমকে যায়। নয়া-খেড়িতে মৌয়া নেই, সব ওরা বেচে এসেছে।

ঝুঝার, নাড়া, কোকার, গাইবানী, চৈতপুরা, মাকাপুরা, বড়াটোলি, কোনো গ্রামে মৌয়া নেই।

কাকে বেচে এল?

কোসিলা বলল, যে সব চেয়ে উঁচু দাম দেয় তাকে বেচেছি, আর বেচব।

—সে কে ?

—বলব কেন ?

কৌয়ারের লোক মোতিহার যাদব বলল, আমাকে না বলিস, পুলিশকে তো বলবি ?

—কেন বলব ?

কোসিলা ছিলাবাঁধা ধনুকের মত টানটান হয়ে দাঁড়াল। বলল, ও সব দিন ভুলে যাও, পুলিশ ডাকল আর চলে গেলাম। নয় উঠিয়ে নিয়ে গেল। জমিদারে-পুলিশে জুলুম এ তো আদত পড়ে গেছে তোমাদের কিন্তু আমাদের মৌয়া আর লুট হতে দেব না।

—তুই নারী মুক্তি দলের, কি, জেন্‌রেল আছিস ?

—যা আছি তা আছি। যা—ভাগ্‌!

নয়া-খেড়িতে যদি কোসিলা খারোয়ার ছিল, ঝুঝারে ছিল কোসিলা বিরজিয়া। নয়া-খেড়ির মেয়েরা যদি কৌয়ারের লোকদের সঙ্গে লড়ে মৌয়া বেচতে পারে তাহলে তারাও পারে। কোসিলা বিরজিয়ার বয়স নিশ্চয় চল্লিশ হবে, কিন্তু খাটাখাটনির শরীর, দেহ তত ভাঙেনি। ঝুঝারের কোসিলা নয়া-খেড়ির কোসিলাকে বলল, এবার একটা মিটিং করো।

—কি নিয়ে ?

—মৌয়ার সময় তো ফুরাল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে আওরতদের মধ্যে বহোত গরম চলছে। ইস কে বাদ কেয়া ?

—দেখি, মিটিং একটা ডাকব তাহলে। কিন্তু গ্রাম গ্রাম থেকে একজন দু'জনের বেশি এল না।

তেত্‌রি বলল, যে আসবে, সে ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রেখে কসম খাবে, যে কোন কথা কাউকে বলবে না।

কোসিলা বিরজিয়া বলল, মৌসি, এখন তো কাটলেও কথা বেরোচ্ছে না। বাঙ্কা পুলিশ কি কম নাকাল করছে আমাদের ?

—তোর মেয়ের খবর পেলি ?

কোসিলা মলিন হেসে বলল, "কাপড়া লত্তা, রোটি আর টাকা

পাব রে মা! বলে যে মেয়ে চলে যায় লেবার কণ্টাক্টারের লরী চেপে, সে মেয়ের খবর মৌসি, কেউ কোনদিন পেয়েছে, যে আমি পাব?

—যাক গে! শুনে গেলি তো সব।

কোসিলা খারোয়ার বলে, তোমাদের কথা তোমরা বলবে।

—বাকি খবর দেবে কে?

—মৌসি দেবে। তোমরা মৌয়ার টাকা কিছু ছেড়ো না। ওটা তোমাদের স্ত্রী-ধন। মরদরা কেড়ে না নেয়।

—যা, ঘর যা বিরজাইন। পথ অনেক।

পালামৌর ইতিহাসের অগ্রগতিগুলি এখনো লেখে নি কোন ইতিহাসকার, কোন পণ্ডিত। সে ইতিহাসটা লেখা হলে তবে তো দিকনির্ণয় হত। প্রশাসন-পুলিশ-সামন্ততন্ত্রের শুভবিবাহ, যা এক অচলায়তন, কোন কোন আন্দোলন দ্বারা তার ভিতে ঘা পড়েছিল, কারা সূচনা করেছিল সে ইতিহাসের, তা এখনো লেখা হয় নি। হয়তো কোসিলাদের সন্তানরা লিখবে।

এ ইতিহাস ওদেরই লিখতে হবে। উচ্চবর্ণের উন্নাসিক পণ্ডিতরা উনিশ শতকে পালামৌয়ের চেরো, খারোয়ার বিদ্রোহের কথা লেখেনি। এ শতকে তারা এই নীরব বিদ্রোহগুলির কথাও লিখবে না। সমাজে চিরকালের দাবিয়ে রাখা মানুষদের বিদ্রোহ, কি ইংরেজ শাসনে, কি স্বাধীন ভারতে, সবচেয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ।

অথচ অবহেলিত, শৃঙ্খলিত, দরিদ্র ও ধনীর অদ্ভুত সমাহারের মিলনভূমি পালামৌয়ে রচিত হচ্ছে ইতিহাস, এখনি, এই মুহূর্তে। সেই ইতিহাসের একটি সূচনা, নারী মুক্তি বাহিনী।

নয়া-খেড়িতে আগে এসেছিল ওরা। আর রাতে নয়া-খেড়ি ও জঙ্গলের মধ্যবর্তী জায়গায় সবাই বসেছিল। বিন্দা সিং ও অনল তলোয়ারের গলাটা কোসিলা বিরজাইনের মনে হল চেনা চেনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গলাই একদিন বলেছিল, কাকে কাকে নিয়ে গেল লেবার ঠিকাদার? নাম বলো, নাম বলো।

বিন্দা সিং কোসিলা খরোয়ারকে বলে, ওদের বলো গ্রামের নাম বলুক, নিজের নাম বলুক, লিখে নিতে থাকো। বলো তোমরা!

—ঝুঝার—কোসিলা বিরজিয়া।

—নাড়া—চামারি তুসাদিন।

—কোকার। কুন্তী নাগেসিয়া।

গাইবানী। তিত্‌লি ভুঁইন্‌।

তেত্‌রি বলে, তিত্‌লি! ভৈঁসী আছিস তুই।

—আর তুই একটা ঘোড়া।

—চৈতপুর। কোসিলা গঞ্জু।

—মাকাপুরা। পুতলী পারহাইয়া।

—বড়াটোলি। ছগনি ভুঁইন।

বিন্দা বলে মৌয়া বেচতে পেরেছ?

পুতলী বলে, হ্যাঁ, বেচেছি। হরনাম সিংয়ের কাছে। আর বছর বছর ওর কাছেই আমরা বেচব।

—যে যে গাঁ থেকে এসেছ, সেই সেখানে নারী মুক্তি দলের মাথা হবে।

পুতলী পারহাইয়া বলে, আমাদের কথা আছে।

—বলো, তোমরাই তো বলবে। আগে বলো, এই যে মৌয়া বেচলে, বাধা পাওনি?

—বাপরে! কৌয়ারের লোকেরা, পুলিশ চৌকি কি আমাদের কম বাধা দিয়েছে? আমরাও বাধা দিয়েছি।

—দিয়ে যাবে, দিতেই হবে। এরা লুট করতে করতে, এদের আদত পড়ে গেছে না। কয়েক বছরে শায়েস্তা হবে।

—জঙ্গলের গার্ডরাও তো ভাগ চায়।

—দেখ, এবার তোমাদের কাছে পৌছে যাবে তোমাদের কি কি হক আছে। গরিব, আদিবাসী, জঙ্গলের ফলে ফসলে হক তাদের।

কোসিলা খারোয়ার বলে, টাকা পেয়ে কি করেছ?

—সেটা তোমরা বলে দাও, কি করব। কিছু তো পেটে খেয়েছি। আর, আছে।

—মরদদের দিয়েছ ?

—যারা বয়ে নিয়ে গেছে তাদের কিছু দিয়েছি।

—এ টাকা আওরতদের। নিজেরা ঠিক করো কি করবে।

—ফরেসের ধাক (পলাশ) পাতাও নিতে পারব।

—সরকারী জমিনে যা আছে সব নিতে পারবে।

পুতলী পারহাইয়া বলল, আমি পাতার দনা আর থালি বানাব, বাজারে বেচব। মাকাপুথার কাছে বাস চলে, হোটেল চলে ভাত-রোটির। তারা কিনবে।

বিন্দা সিং বলে, এরপরে কি করবে ?

সবাই কোসিলা বিরজাইনকে এগিয়ে দেয়। ছগনি বলে, ববুয়া! তোমাদের সময় তো নষ্ট করে লাভ নেই, আমরা নিজেরা কথা বলে নিয়েছি। কোসিলা বিরজাইন আমাদের মধ্যে পড়তে পারে, নাম লিখতে পারে নিজের।

—সত্যি কোসিলা ?

—খুব অল্প জানি। মা তো মিশনের বাগানে কাজ করত। তখন ··

—তুমিই বলো।

—কোথা থেকে শুরু করি ?

তেতরি বলে, ছোট করে বল্।

—হ্যাঁ···অনেক কথা মনে পড়ছে···এখন সিধা কথা ববুয়া, জঙ্গল আমাদের জীবন। জঙ্গল তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাঠের কারবারী মালিকরা, থানা, পুলিশ জঙ্গল আপিস, সবাই মিলে জঙ্গল কাটছে আর লরীতে, রেলে চাপাচ্ছে।

—সে তো জানি।

—আমাদের তো বছর-ভোর বাঁচায় জঙ্গল! এখন দশ মাইল হেঁটে গিয়ে লাকড়ি আনব, দশ মাইল হেঁটে ফিরব, তবে বেচব, দশ কি বারো টাকায়। তাও ফরেস গার্ডকে দু'এক টাকা না দিয়ে রেহাই

পাব না। আগে জঙ্গল ছিল ঘরের কাছেই। এখন জঙ্গল দূরে চলে যাচ্ছে।

—মৌসি, গাছ কেটেই তো তোমরা লাকড়ি আনো ?

—সে কি গাছ, ববুয়া ? শাল, সিমার, ধাক, কোসোম, দামী গাছ তো আমরা কাটি না। ফরেস আপিস লাগায় ফরেস আপিস কাটে। আগে বাঁশের জঙ্গল ছিল, এখন কোথায় ?

—"জঙ্গল বাঁচাও" লড়াই করতে হবে।

—কৈসে ?

—এর জন্যে অনেক প্রচার চাই। একা নারী মুক্তি দলের কাজ নয় এটা। শোষিত মুক্তি দল কাজ করবে। সঙ্গে তোমরাও থাকবে।

কোসিলা বিরজাইন ঈষৎ তিক্ত হাসে। বলে, যারা ভোট নিতে আসে, সবাই বলে, শোষিত, দলিত, আদিবাসীর, গরিবের উপর জুলুম বন্ধ করবে।

—কেউ করে কিছু ?

—কৈসে করে ববুয়া ? ঠাকোর আর বরাস্তোনরাই আসে। জুলুমবাজরা আসে আর বলে, জুলুম বন্ধ করবে।

—আমরা প্রচার দেব, ইস্তাহার ছড়াব। গ্রামে গ্রামে পুরুষদেরও চাই। আওরত, মরদ, যে জুলুমের শিকার সেই এসো শোষিত মুক্তি দলে।

—আসবে, আসবে। সবাই যে জুলুমের শিকার।

—তারপর টাউনের কাছাকাছি নয়, দূরে, পরপর কয়েকটা কাঠের লরী আটকাতে হবে। ফরেস-এর বড় আপিস আর টাউনে পুলিশ-সায়েবের কাছে রিপোর্ট করবে।

—কাজ হবে ?

—দেখাই যাক। আর ওরা যখন জঙ্গল কাটতে যাবে, তখনো লড়তে হবে। ওখানেই। না লড়লে কিছু মিলবে না মৌসি। এই তো কাজ পেলে। এ কাজ চলবে।

—হ্যাঁ, বুঝেছি।

কুন্তী নাগেসিয়া. ছিপছিপে, তন্বী, সুঠাম, সে হাত তোলে।

—আমি বলব।

—বলো বহিন্।

কুন্তী বলে, কৌয়ারের গুণ্ডা শেরদিল সিং যে সমানে পিছনে ঘুরছে আমাদের।

—কেন?

—বলছে, কৌয়ারের জঙ্গলে কাজ করবি। টাকা পাবি। জোয়ান আওরতদের কাজ আছে।

—কেন বলছে তা বুঝেছ?

—কৈসে বুঝব না ভৈয়া? যত মেয়ে এসেছে, আর যত মেয়ে আসেনি, সকলের ইজ্জতে তো মালিকদের জবরদখল চলে আসছে। কুনারী ভূঁইনকে নিয়ে বহোত শোর উঠেছিল, কিন্তু কুনারী প্রথম মেয়ে নয়, আর শেষ মেয়েও নয় ভৈয়া। আর সহ্য হয় না।

বিন্দা সিং বলে, এ জন্যে শোষিত মুক্তি দল লড়বে। এ লড়াই জারি থাকবে। এক কৌয়ার যায়, আরেক কৌয়ার আসে। আদত পড়ে গেছে। কিন্তু আদত এই জন্যে পড়েছে, তোমরা লড়াই করনি, বাধা দাওনি বলে।

—কে আমাদের সঙ্গে ছিল? নালিশ করব কার কাছে? কোন থানা লিখত রিপোর্ট? সব তো মালিকদের গোলাম।

তেত্‌রি হাতে খইনি ডলছিল, এখন সকলকে দেয়. নিজেও নেয় ও বলে, কুনারী ভূঁইনের কথা অখবরে বেরিয়েছিল বলে এত শোর উঠেছিল। যাক, সব কথা তো হয়ে গেল। কোসিলা বিরজাইন বলে, একটা তো কাজ হয়েছে, যে এখন আমরা অন্তত, "কামিয়া আছিস, লুক্‌মা (জলখাবার) আর একসের ধান নিয়ে কাজ কর" বললে দৌড়াই না।

—সাহস পেলে কি করে?

—এখন তো রাঁচি, টাটা, ধানবাদ, রেলে চেপে দূর দেশ, চলে যাওয়া যায়, কাজও যা হোক মেলে।

—কামিয়ৌতি গয়ের কাম্নুনী।

—কাম্নুনী কাজ ওরা কবে করল? ওরা চলে ওদের কামুনে। আমরা এখন মাঝে মাঝে পালাই। ওরাও লোক পায় না। ফলে সিধা বলে দিই, লুকমা, বা ধান নেব না। টাকা দাও, কাজ করব।

—কত পাও?

—চার-পাঁচ-ছয়, যা মিলে! আচ্ছা বরুয়া, আমরা চলি।

—এখন ফিরতে পারবে যে-যার গাঁয়ে?

—রাতে ঝুঝারে থেকে যাব। সকালে যে যার ঘরে চলে যাব।

ওরা চলে যায়। তেত্‌রি বলে, অখবরে ছাপাও। তাতে কাজ হবে।

—সব কি পারব?

—স—ব হয়ে যাবে।

কোসিল্লা খারোয়ার বলে, তশীলদারদের লাশ বেরোলে মুশকিল হবে।

—রোজ পাথর মাটি ফেলছি, চাপা পড়ে যাবে।

তেত্‌রি বলে, বেঁচে গেলে খুব। কিন্তু ববুয়া, আর এমন কাজ কোর না।

—ধরা পড়বে, নয়া-খেড়ি জ্বলবে, তোমরাও মরবে···

—আবার কেউ আসবে মৌসি!

॥ তেরো ॥

কপিল শ্রীবাস্তব বলে, কি তেত্‌রি মৌসি! এবার কিসের পোরমিট?

—ধাক্ পাতা নেব।

—কি হবে?

—পিলেট হবে, কটোরা হবে। ছেলেরা ভাতের হোটেলে বেচবে।

—যতজন নেবে, এক সঙ্গে এসো।

—রবিবার আসব। বহুজী কোথায়?

—ভিতরে। কেন?

—ঘাসের চাটি কিনবে বলেছিল।

ভিতরের ঘরে সরস্বতীর সামনে তেত্রি ঘাসের চাটি নামিয়ে দেয়। আস্তে বলে, কাগজ আছে। আর এ কাগজের জলদিও আছে।

তেত্রি বেরিয়ে আসে। বলে, আমাদের গাছ লাগাবার কাজে কবে লাগাবে?

—হবে, সময় হলেই লাগাব। তবে ওপরঅলার "হাঁ" মিলে যায় তো নতুন জিনিস শেখাব।

—কি?

—ফরেসে যেখানে বন পাতলা, সেখানে মুমফালি লাগাব।

—হবে?

—হতে পারে। টোড়ির দিকে তো হয়।

—কাঁঠাল আর জামুন লাগাও। আমরা খেয়ে বাঁচি।

—তোমরা গ্রামে লাগাও আগামী বর্ষায়, আমি চারা দিয়ে দেব।

—বহুজীকে কাজ দিয়ে গেলাম।

কপিল শ্রীবাস্তব ও তেত্রি ভুঁইন দাঁড়িয়ে খাদটি দেখছিল। কপিল কপাল কুঁচকে থাকে ও বলে, পাথর ফেলে চলতে হবে আরো।

—কোনো অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে?

—খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না, তবে এখানে তো ঘুরে গেছে পুলিশ।

—একবার নয়, কয়েকবার।

—কতদিন হল?

—দু'মাস তো বটেই।

—কি করে হিসাব করছ?

—তার পরদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরমি খারোয়ারের মেয়ে হল। পরমির জ্বর হচ্ছিল। ওকে একমাসের ওষুধ দিল, আবার একমাস বাদে দেখাতে বলল। কাল গিয়েছিল, তবে তো দু'মাস হল।

কপিল মাথা হেলায়।

তারপর বলে, তোমরা এ ফরেস্টের গাছ কখনো কাটবে না, মনে রেখো।

তোমাদের জ্বালানির জন্যে বাইরে যে বাঁওলা, গিটা, কুরুম গাছ আছে তাই যথেষ্ট।

—এ বনে লাকড়া নেই, হুড়ার নেই, খুব বেঁচে গেছি। থাকলে ওরা ঠিক চলে আসত।

—মৌসি, হুড়ার-লাকড়া নয়। মানুষ সব চেয়ে ভয়ানক জানোয়ার। এখানে হরবখত পাথর মাটি ফেলে চলো। খবর জানাজানি হলে কি হবে তা আমি ভাবতে ভয় পাই।

হাঁটতে থাকে কপিল শ্রীবাস্তব। বলে, প্রাইভেট মালিকানায় জঙ্গল তো রাখতে পারে না, গৈরকানুনী। রেখেছে কৌয়ার! আর, এ জেলায় তো সে সব কাজের লোক নেই। থাকলে গৈরমজুরোয়া খাসজমিনে আদিবাসী মেয়েরা একসঙ্গে কোঅপারেটিফ করে ঘাস লাগাতে পারত, সাবুই ঘাস, বা কোনো গাছ!

—কৈসে? গৈরমজুরোয়া জমিনেও তো মালিকের থাবা। সে লড়াই এখনি শুরু করা যাবে না।

কিছু কাঁঠাল, জামুন, পপিতা লাগাও নয়াখেড়িতে। নিজেরা খেতে পারবে, বেচতে পারবে।

সময় লাগাবে খানিকটা, ওদের বোলো।

—শুধু লিখে দিক বহুজী। ছাপাই করবে এরা।

—হ্যাঁ, যাও। থাক্ গাছ সব ন্যাড়া কোর না।

—কেন করব।

—আচ্ছা!

ছড়াতে থাকে, ছড়াতে থাকে ইস্তাহার। এস. পি. ফরেস্ট ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ডাকেন। বলেন, দয়া করে যদি বিকেলে বাড়িতে চা খেতে আসেন।

—কি ব্যাপার? সেদিনই তো আপনার লাভলীর জন্মদিনে খেয়ে এলাম।

—মেয়ে আর মা তো রাঁচিতে।

—হ্যাঁ, ভাবী তো কলেজে পড়ান।

—আর মেয়ে পড়ে ওখানে।

—ফলে বাড়ি খালি।

—চা খাওয়াতে পারব।

—আসব।

ডি. এম. ডি. মোটর সাইকেলে চেপেই আসেন।

—গাড়ি কি হল?

—ফরেস্টের বিরুদ্ধে কোরাপশানের যত চার্জ, তার পরেও গাড়ি নিজের কাজে লাগাব?

—চার্জ আপনার নামে অনেক, তাই না?

—অনেক। জঙ্গল কাটাই কেন বন্ধ করতে চেষ্টা করছি, জঙ্গল এলাকায় কেন গ্রামের লোকদের নিয়ে মিটিং করছি, কেন জঙ্গলের রেভিনিউ বাড়াবার জন্যে খয়ের, কুসুম আর পলাশ প্ল্যান্টেশান করছি, কেন বিড়িপাতা জঙ্গলকে প্রোটেকশান দিচ্ছি···

—হবেই। আপনি একে রাজপুত নন।

—সব চেয়ে বড় অপরাধ।

—তাতে বাঘ সিংহদের চক্করে ঘা পড়েছে।

—কিচ্ছু করা যাবে না এখানে। বিহার একটা অন্য জগৎ। আর পালামৌ তো ··

—বিক্রম সংবতে পড়ে আছে।

—ওঃ! ওই লারাতুর কৌয়ারের কথা আবার বললেন। লোকটাকে দেখলে আমার···

—রাজপুত বিরাদরি!

—যাক গে, চা খাওয়ান।

—ভাবী ভালো আছেন?

—ডালটনগঞ্জে ভালো কে থাকবে বলুন ?

—তাঁর বন্‌সাই বানানো চলছে ?

—চলছে। কপিল শ্রীবাস্তব শিখিয়েছিল। আর আমাদের ডিপার্টমেন্ট। কপিল শ্রীবাস্তবের মত একটা লোককে বিট অফিসার করেই রেখে দিল।

—মস্ত অপরাধ, না ? বিধবাকে বিয়ে করেছে।

—সে তো পুরনো কথা।

—অপরাধ, অপরাধই থেকে যায়।

—লোকটা জঙ্গল বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জানে। কোন কাজে লাগানো গেল না। ওর জন্যে কিছু করাও যাবে না। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করেছে। চমৎকার জঙ্গল করেছে একটা, সেটা প্রোটেক্টেড করে দিয়েছি, শাল আছে বলে।

—কৌয়ারের সীমানার বাইরে তো ?

—হ্যাঁ।

—নিন, চা এসে গেছে।

—সাজিয়ে গুছিয়ে চা আনতে পারে ?

—আমার বউ বাপের বাড়ি থেকে এনেছিল। এখানে ওকে দিয়েছে, আমার যত্ন হবে বলে। আপনার তো ঘরে লছমী, হোম কুকিং খাচ্ছেন। ছেলেরা মামাবাড়ি থেকে পড়ছে, নিশ্চিন্ত।

—কি করা যাবে, পড়াব কোথায় এখানে ?

—নাঃ, বিহারে কোন শহরই আর মাফিয়ামুক্ত থাকছে না, সরকারী চাকরি করা খুব বোকামি হয়ে গেছে।

—বলুন! কি জন্যে ডেকেছেন ?

—ইস্তাহারগুলো দেখেছেন ? এ জন্যেই ডেকেছি। এই দেখুন।

—দেখেছি। আমার আপিসের সামনে গাছের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে গেছে ?

—"ফরেস্ট আইনে আছে" বলে যা যা লিখেছে, তা কি সত্যি ?

— হ্যাঁ....সত্যি। ব্যাপারটা শুধু জঙ্গল দপ্তরের আইন নয়। এখন

তো পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা, বনজঙ্গল রক্ষা, গাছ লাগানোতে উৎসাহ দান, পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে।

—তা পাচ্ছে।

—ভারতসরকার তো আদিবাসীদের বনজ দ্রব্য নেবার অধিকারও দিয়েছে।

—মৌয়া ওরা উঠাবে?

—আগে আমরা ওদের পয়সা দিয়ে মৌয়া তুলাতাম। এখনো তোলাই। নিয়ম হল সে মৌয়া বনবিভাগে জমা পড়বে। সে তো কোনদিন পড়ে নি। জমিদাররা কেড়ে নিয়ে গেছে আর বাজারে বেচেছে।

—লাভ থাকে ওদের?

—থাকবে না? বনবিভাগ মজুরি দিয়ে মৌয়া তোলাল। কিন্তু কেড়ে নিয়ে বেচল ওরা। পাঁচ হাজার মৌয়া গাছ পালকি থানার বারো / চৌদ্দটা গ্রামে। সে মৌয়া আমাদের দপ্তর দিনে দু'চার টাকা মজুরি দিয়ে পনেরো বিশ হাজার আওরতকে দিয়ে তোলাল। যারা কোন খরচ করল না, মেহনত দিল না, তারা ওই মৌয়া আট-দশ লাখ টাকায় বেচল।

—গড।

—মৌয়া ওরা খায়, ওর বীজে তেল হয়, খোল বেচা যায়। মৌয়া একটা ক্যাশ ক্রপ।

—তারপর? আপনারা তো লস্ খেলেন।

—বনবিভাগ লস্ খায়, কোন কোন অফিসারের প্রফিট আসে।

—হ্যাঁ···বুঝছি।

—থানা পায়, অফিসার পায়।

—তাহলে নয়া-খেড়িতে কি হল?

—সরকার এখন সংশোধিত আইনে বনজ ফসলের অধিকার আদিবাসী আর গরিবকে দিয়েছে। দেখুন, ওরা সরকারী জঙ্গল, সরকারী জমিন্ থেকে বনজ দ্রব্য নিজেরা সংগ্রহ করতে পারে, বাজারে বেচতে পারে।

—নারী মুক্তি দল তাই কোন বেআইনী কাজ করে নি?

—না সিংজী! করে নি।

—আইডিয়া তো ক্যাচ করে গেছে। আরো দশ বারোটা গ্রামে এক কাজই হয়েছে?

—আমি খুব খুশি। আমরা তো ফরেস্ ব্যাপারে সরকার কি কি অধিকার দিয়েছে, তা জানাবার কোন ব্যবস্থা করি নি। মানুষকে জানতেই দিই নি।

—কেন?

—জানাবার কোন ক্ষমতা আমার হাতে নেই। না কাগজে বেরোয়, না রেডিওতে বলে, খবর জেনে ওরা প্রচার করছে, আমি খুশি।

—খুব যে দেখি সর্কুলার পান।

—ও তো সরকারী ধূমধাড়াক্কা। তবে হ্যাঁ, এখন "মানুষকে অরণ্য-সচেতন করো" নির্দেশ এসেছে। আমি সব জায়গায় জানিয়ে দিয়েছি, যে গ্রামবাসীদের নিয়ে মিটিং করো, তিনদিন ধরে ক্যাম্প করো, ওদের বুঝাও, গাছ কেটো না, গাছ লাগাও। জানিনা ক'জন এ কাজ করবে, নারী মুক্তি দলের কথাই বা কতদূর ছড়াবে। যতটা ছড়ায়, ততই ভালো।

—তবে এ ইস্তাহার ঠিক আছে?

—পাক্কা। আপনাকে সরকারী সার্কুলার পাঠিয়ে দেব।

—আপনি এদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশান নেবেন না?

—না। আমি তো নয়া-খেড়িতে একটা সচেতনতা শিবির করতে চাই।

—ডিপার্টমেন্ট চটে নি?

ডি. এম. ডি. হাসে।

—এই ইস্যুতে পাটনা থেকে তলব এসেছিল, যে আমার অবহেলায় গ্রামবাসী মুনাফা লুটছে, ফরেস্ রেভিনিউ হারাচ্ছে। আমি এম. ডি.-কে জবাব দিলাম, গত বিশ বছরে বনবিভাগ মৌয়া থেকে কোন

রেভিনিউ পায় না। ফরেস্ থেকে ব্যবসা করে অন্তরা। সার্কুলারে যা বলা আছে, এরা সেইমতো কাজই করেছে।

—আপনিও সরকারী কোপে পড়বেন।

—লেট দেন। আমি আর চাকরি করতেও চাই না।

—কোথায় যাবেন ?

—এখন অনেক জায়গা হয়েছে। এনভায়রনমেণ্টাল স্টাডি আর রিসার্চের জায়গা আছে। সাউথে অনেক।

—আপনাকে হিংসে হচ্ছে।

—এখানে কাজ করা যাবে না। প্রাইভেট ফরেস্ট কেউ রাখতে পারে না, কিন্তু কৌয়ারের জঙ্গলে হাত দিয়ে দেখুন।

—ও কাজ করবেন না।

—না। ধড়ে মাথাটা না থাকলে···

—কৌয়ার সব পারে।

—লোকটা যে কি···।

—এটাও দেখুন!

—দেখেছি!

—এটা কি গৈরকানুনী ?

—সিংজী! গৈরকানুনী তো নয়। এটা তো···

—আরেকটু চা আনতে বলুন।

—গিয়ে বলে আসি। রান্না করছে, শুনতে পাবে না।

এস. পি. উঠে যান। ডি. এম. ডি. ঘরটা দেখেন। নেহাত নিরাভরণ ঘর। কিছু চেয়ার, একটা টেবিল, বুকশেলফে কিছু বই, ম্যাগাজিন। দেয়ালে কন্যাসহ সুখী দম্পতির ছবি। এস. পি-র বউ সমাজ-অর্থনীতিতে রিসার্চ করছেন।

এস. পি. ঢোকেন।

—চা বলে এলাম। কি দেখছেন ?

—হিন্দী সিনেমায় একটা সৎ ইন্‌স্পেক্টারের ঘরেও যা থাকে, আপনার কিছুই নেই।

—না। ব্রিটিশ আমলের এ বাড়ি কি সাজানো সম্ভব? তবে ভাবীজীর দেওয়া বনসাইটা নিয়ে গেছে নীলম্! ওর খুব পছন্দ।

—কপিল কি বনসাই করেছে! অসামান্য। ওর আইডিয়াতেই ছাতিম এনকারেজ করছি।

—কি বলছিলেন?

—চা-টা খাই। নতুন ক্যাসেট কিনলেন কিছু?

—না। সারাদিন যা চলে।

—শুনছি লাতেহারে মাধোলালকে মেরে দিয়েছেন?

—অনেক সিধা হয়ে গেল ব্যাপারটা। বলাৎকারী, খুনে, ডাকাত, কে ওকে কোর্টে তোলে, জানি যখন ক'মাস বাদেই ছাড়তে হবে? সিধা মেরে দিয়েছে পুলিশ! পুলিশকে খুন করলে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেবে?

—মাফিয়া। মাফিয়া।

—নিন, চা এসে গেছে।

—চা-টা সত্যি ভালো।

—মতি বানায় ও ভালো। চা-খোর লোক তো।

—আমার স্ত্রী তো চা খায় না। আমাকেও বলে দুধ খেতে। খুব ঝামেলা।

—নীলম্ চায়ের ভক্ত।

—আপনাদের লাভ ম্যারেজ?

—আর বলেন কেন। নিন·· বলুন।

—মনে হচ্ছে জরুরী ব্যাপার?

—হ্যাঁ প্রকাশজী। খুবই আর্জেন্ট।

—এ ইস্তাহারে গৈরকানুনী কিছু নেই। পালামৌয়ের জঙ্গল কারা নষ্ট করছে সবাই জানে। ডিপার্টমেণ্ট আছে, থানা আছে, টিম্বারমার্চেন্ট আছে, মালিক আছে। আমরা রোজ যদি দশ হাজার গাছ লাগাই, তো পঁচিশ হাজার গাছ কাটা পড়ে।

—রিয়ালি!

—আমরা বলি বটে, এরা গাছ কেটে বন ধ্বংস করছে। কিন্তু এরা কাটে ঝাটি গাছ। যদিও সেটাও আইনী নয়। এই ইস্তাহার বলছে, কাঠবাহী লরি আটক করতে হবে, মাল গুদামে নিতে হবে, অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। আমরা তো সার্কুলার দিচ্ছি। এ কাজ যারা করবে তাদের পুরস্কার দেব।

—কিন্তু "শোষিত মুক্তি দল" কেন এ কাজ করবে?

—ও সব আপনারা বুঝুন। আমার ধৈর্যের সীমা চলে গেছে অনেকদিন। আমি যা করতে পারছি না, কেউ করুক, আমি খুশি।

—আপনি চান···

—রাজপুত বিরাদরি, জঙ্গল আপিস, টিম্বার মার্চেন্ট আর পুলিশের অশুভ চক্র একবারও আঘাত পাক। যদি এরা লরী আটকায়, আপনি কি করবেন?

—পুলিশী অ্যাকশান নেব না। কিন্তু আমার সমস্যা আরেকটা।

—"শোষিত মুক্তি দল" নামটা নিয়ে?

—হ্যাঁ। ডি. আই. জি. কনভিন্‌স্‌ড যে এটা উগ্রপন্থী সংগঠন। আমি তো তেমন কিছু পাচ্ছি না···আমার উপর চাপ আসছে···আমি কিছু পাচ্ছি না···কিন্তু একটাই খটকা লাগছে। কোয়ারের পাঁচ মস্তানের কি হল?

—একটা খবর দিয়ে যাই, যাচিয়ে নেবেন।

—বলুন।

—আমি টাকা খাই না, লুটের ভাগ নিই না, এর অসুবিধে অনেক, সুবিধেও আছে। খবর-টবর পাই।

—কি খবর?

—বেআইনী কাঠ চেরাই কল এখন খুব লাভজনক ব্যবসায়।

—তা তো হবেই।

—লারাতু রোডে লালবদন বানিয়া হঠাৎ···ছ'মাস আগে করাতকল কিনেছে।

—তাতে কি?

—যথেষ্ট বড়, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, বড় স-মিল।

—সে···কিনতেই পারে।

—ওখানে তো অন্যেরা গাছ নামায়। ও চেরাই করে। কিছু টিম্বার মার্চেন্টের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। তবে খবর হল, পুরো টাকাটাই তশীলদার সিংয়ের ছিল।

—কত টাকা?

—বড় স-মিল! একলাখ পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা তো হবে।

—তশীলদারের নাম আছে কোথাও?

—না। তবে মোহনলাল টিম্বার মার্চেন্ট ক্ষেপে গেছে। ও ওখানে গাছ নামাচ্ছিল এই স্বার্থে, যে তশীলদার তাকে বলেছিল কোয়ারের ফরেস থেকে শাল গাছ দেবে। তশীলদার নিজে গিয়েছিল মোহনলালের কাছে।

—মোহনলাল বলছে, ওর সঙ্গে আর তিন-চারজনও ছিল। তাদের ও চেনে না। তবে তশীলদার এ নিয়ে গত বছর থেকে কথা চালাচ্ছে।

—আমাকে এ সব বলবে?

—বলতে পারে, না বলতে পারে। তবে ক্ষেপে আছে যখন, বলতেও পারে!

—ও···তাহলে খুবই সম্ভব যে তশীলদার ভেগে গেছে, অন্তত ভেগে যাবার কারণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখি··এই একটা চাপ থেকে মুক্তি পেলেও তো বাঁচি।

—অনেক রাত হল, আমি উঠি।

—এ সব কথা কিন্তু গোপন রাখবেন।

—নিশ্চয়।

—চাকরি হয়তো আমার যাবে।

—মনে হচ্ছে? আপনি তো রাজপুত?

—এদের লাইনে চলি না, তাই বিরাদরির কলঙ্ক।

—ছেড়ে কি করবেন।

—চাকরি নয় আর। রাঁচি-পালামৌ বর্ডারে রাঁচি সাইডে জমি,

মডার্ন ফার্ম করব, চাই কি, ইনডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি অফিস করব। পুলিশম্যানরা, আর্মির লোকরা রিটায়ার ক'রে যা করে এখন। আমি শিক্ষিত ছেলে, রাজপুত আছি নিশ্চয়ই, কিন্তু এইসব গাঁওয়ার রাক্ষসদের গোলামী করি কি করে? পাটনায় আমার বস্‌রাও তো চটা আমার উপর।

—সাবধানে থাকবেন।

—নিশ্চয়। রিভলভার নিয়ে শুই।

—সিংজী! তিরাশিতে এরা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের গাড়িতে টাইমবোমা রেখেছিল।

—জানি। ডি. সি. গাড়িতে ছিল না, তার ড্রাইভার ছিল।

—এরকম অনেক গল্প বলতে পারি।

—আমিও। পরে হবে।

—হ্যাঁ, আপনার ফার্মে বসে শুনব।

—আপনিও সাবধানে থাকবেন।

—থাকি। তবে আমি ভাগ্যবাদী।

—ছিলাম না, হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, গুডনাইট।

এস. পি. ঘরে ঢোকেন।

—মতি, এ মতিরাম!

—কা, বাবু?

—দরজা জানলা বন্ধ করো, টেনে দেখ।

—আপনি স্নান করে নিন।

স্নান, খাওয়া, সবই রুটিন। নীলম আর লাভলী থাকলে এই রুটিনই কত উৎসব মনে হয়।

শোষিত্‌ মুক্তি দল। শোষিত্‌ মুক্তি দল। ডি. আই. জি-র ব্রিফিং মনে পড়ল।

—উগ্রপন্থী রাজনীতি সবচেয়ে খারাপ।

—হ্যাঁ সার।

—দেখ কি হচ্ছে বিহারে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, যে এই আই. পি. এফ. আরো শক্তিশালী হবে।

—তাই মনে করেন ?

—হতেই হবে। কোরাপশান, জাতপাতের লড়াই, শোষণ আর গরিবী তো বিহারের রক্তে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ সিং, আমি জানি কেন নকশালরা মাথা তুলছে। কিন্তু আমরা দেখব, আইন আর শৃঙ্খলা বিপন্ন হচ্ছে কিনা।

—ল' অ্যান্ড অর্ডার তো নেই বিহারে সার।

—এ সব কথা বোল না। পালামৌয়ে যেন ওরা ঢুকতে না পারে।

—নিশ্চয় দেখব।

—জমি মালিকরাও ফৌজ বানাবে।

—ওরা ফৌজ রাখে।

—এখন মস্তান, খুনে, গুণ্ডা রাখে।

—হ্যাঁ সার!

—সেটা আর্মি নয়। এবার আর্মির রিটায়ার লোক নেবে!

—সে বিষয়ে কোনো নির্দেশ আছে ?

—জাস্ট নকশালাইট টাইপ অফ মুভমেণ্ট বন্ধ করো। ইউ উইল গো ফার।

—ইয়েস সার।

কিন্তু এস. পি-র মনে এখন দারুণ দ্বন্দ্ব। কি করা যায় ? এখন অবধি ল' অ্যান্ড অর্ডার বিঘ্নিত হয় নি। হতেই পারে। কিন্তু না হলে ? উগ্রপন্থী ধরে নাম কেনা খুবই ভালো। কিন্তু মিডিয়া—আক্রমণ ঘটলে ?

পরিবারে বা শ্বশুরবাড়িতে সবাই চাকুরে। রাজনীতিতে নেই কেউ, কোনো শিল্পপতি নেই, মোটকথা, সে বিপদে পড়লে তাকে বাঁচাবে এমন কোনো "লবি" নেই।

কাজ ছেড়ে দিতে সে এখনি চায় না। কিন্তু নীলম চায় না ও পুলিশের কাজ করুক।

নীলম শান্তি চায়।

শান্তি এখন কোথায় আছে ?

মোহনলালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। "শোষিত্ মুক্তি দল।"

খবর নিতে হবে। টাউনে ওদের লোকজন কে আছে?

॥ চৌদ্দ ॥

মোহনলাল বলে, তশীলদার ভেগে গেছে?

—আমি তো জিজ্ঞাসা করছি।

—আমি তো ওকে ছাড়ব না।

—এটা তবে সত্যি, যে ও আপনার সঙ্গে কথা বলে তবে স-মিল করে?

—স-মিলের আইডিয়া তো ওরই ছিল। অনেকদিন ঘুরছিল।

—কতজনের সঙ্গে আলোচনা করেছিল?

তশীলদার? কারো সঙ্গে কথা বলে নি। কৌয়ারের ভয়ে কাঁপত।

—ওর নামে তো নেই।

—না।

মোহনলাল সিং ধীলন হাসে।

—লালবদন বানিয়ার নামে আছে। লাইসেন্ তো থাকবে না। জমি লালবদনের নামে, মেশিন তার নামে, স্টাকচার তার নামে। আরে। আমি তো ফেঁসে যেতে রাজী নই। দশটা পাকা শাল গাছ।

—ওখানে শালগাছ কোথায়?

—লারাতুতে কৌয়ারের জঙ্গলে ওর আধা শেয়ার আছে বলেছিল।

—আপনি কৌয়ারকে চেনেন?

—দেখেছি দু'একবার। আমার ট্রাকসার্ভিস নিয়েছে। কিন্তু হারামী লোক। হাজার টাকায় কথা হয়, দিল সাতশো। তাতেই আর ট্রাক দিই নি। বলেছিল, রোড হলেও মোহনলালের ট্রাক এ পথে যাবে না। বিজনেস করি, আমার ট্রাক তিনটে জেলায় চলে। গৈরলাইসেন্ কাজ করি না। আমি কেন ওকে ভয় পাব?

—না, তা কেন পাবেন। এসেছেন, দেখে যান। এখানে কোনো গৈরকানুনী কাজ হয় না।

—না, আপনার তো সুনাম আছে।

—ওই স-মিল আমি কিনতে না পারি, যদি পাই।

—শুনেছি কৌয়ারের ছেলে অন্য রকম। তাকে বলুন, নয় তার শ্বশুর ধরমবীরকে বলুন।

এ ভাবেই কথাটি ছড়ায়। সব শুনে শ্বশুর ধরমবীর জামাই অমরজিৎকে বলে। অমরজিৎ কৌয়ারকে বলে।

—তশীলদারকে বিশ্বাস করতেন তো খুব? সে আপনার টাকা সরিয়ে স-মিল করেছে। বুঝেছেন? আর আপনার জঙ্গলের আধা ভাগ তো তার। তাই মোহনলালকে দশটা শালগাছ বেচেছে।

কৌয়ার প্রথমটা মোহনলাল, লালবদন, সকলকে মেরে ফেলবেন বলে ক্ষেপে ওঠেন।

ধরমবীর বলে, কবে আপনি ধীর স্থির হবেন?

—তুমি কি বুঝবে? আমি জ্বলছি তশীলদার আর লালবদনের ওপর।

—লালবদন বা কি করবে? তশীলদার যদি তার ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজের কাজ হাসিল করে?

—এ কথাই সেদিন ভীম আমাকে বলত।

—তারা তো ওর সঙ্গেই ছিল। কে জানে, কি ভাগবাঁটোয়ারার হিসাব হয়েছিল?

—ভেগে যাবে? কোথায় ভাগবে? তার বউ ছেলে মেয়ে, মা সব তো এখানে।

—তাদের তাড়িয়ে দেবেন?

—মাথায় বসিয়ে রাখব?

ধরমবীর বলে, ভৈয়া? কৌশলে কাজ উদ্ধার করো।

লালবদনকে বলো ওই স-মিল মেল তোমার। আর মোহনলালকে জানাও সে কথা।

—তশীলদার টাকা পেল কোথায় ?

অমরজিৎ বলে, ব্যাঙ্কে যেত কে ?

—তিজৌরির হিসাব তার কাছে, সব তার হাতে···

—ছি ছি! সে আত্মীয়, জ্ঞাতি হয়। বিরাদরির মধ্যে সেও একজন।

—ওহি তো বাত পিতাজী! চাচী, ঔর নানী, ঔর বাচ্চাদের বের করে দিলে কি হবে? চাচী তো কেঁদে কেঁদে পাগল হচ্ছে। আপনার নামই কি খারাপ হবে না?

—চলে যাক বাপের বাড়ি।

—সেও আমাদেরই পাঠাতে হবে।

ধরমবীর বলে, টাকা নাড়াচাড়া করতে করতে মানুষের মনে লালচ এসে যায়।

—কিন্তু কেন? খেত, থাকত, সসম্মানে থাকত। মাসে হাজার টাকা দিয়েছি।

—ভৈয়া, লালসা মানুষের স্বভাব। খাবার দেখলে খাবার চাইবে, দৌলত দেখলে দৌলত চাইবে, ক্ষমতা দেখলে ক্ষমতা চাইবে। তশীলদারও তার মত করে আখের গোছাতে গিয়েছিল।

—ভকিল কিছু জানবে।

অমরজিৎ বলে, আপনি তো আমার উপর ভরসা করেন না। আমার মনে হয়, আমাকে আপনি সাবালকই মনে করেন না। ছেড়ে দিন আমার ওপর। দেখবেন সব খবর বের করে আনব, সব জেনে যাবেন।

—লালবদনের এত সাহস!

—পিতাজী। আপনার নামে এমন আতঙ্ক, যে আপনার ডানহাত তশীলদার যদি তাকে বলে, বলে এ কাজটা করো, সে না করবে কি করে?

—তাকে আমি···

—না। একটা কমজোরী থানিয়াকে মেরে আমাদের লাভ কি

হবে? তশীলদারের আইডিয়া তো খারাপ ছিল না। এখন···ওই স-মিল আমি চালাব।

—সে পালায় নি অমরজিৎ, নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে।

—তাহলে পালায় নি। পুলিশ তো খুঁজছে।

তশীলদারনীকে জেরা করে জানা যায় না কিছু। হ্যাঁ, তশীলদার টাকা দিয়েছে তাকে মাঝেমধ্যে। বলেছে, সে টাকায় লাতেহারে বউয়ের নামে জমি কিনতে, আর তশীলদারনীকে নিয়ে একবার গিয়ে লাতেহারে ব্যবস্থাও করে এসেছে। স-মিলের কথা ও জানে না, তবে তশীলদার ওকে বলেছিল, ক্রমে ক্রমে অবস্থা ভালো হবে ওদের।

অমরজিতকে বলে, সে কেমন মানুষ ছিল আমি জানি না। কিন্তু কোয়ারের জন্যে জান দিতে পারত। তাঁরই বিশ্বাস যখন চলে গেল—

—চাচা যে বিশ্বাস রাখতে দিল না···

—এখন আমি এখানে মুখ দেখাতে পারব না। বন্দোবস্ত করে দাও, মিনতি করছি, আমি বাপের বাড়ি চলে যাই।

তারপর বলে, আমার মন বলছে, ফিরবে, ফিরবে। ফিরলেই আমাকে জানাবে, কেমন?

—আপনাদের কাছেই ফিরবে।

—অনেক কাজ করেছিল···আমি না না করতাম, সন্তানদের ওপর লোকের শাপ লেগে যাবে বলে ভয় পেতাম···

ও বলত, কোয়ারের হুকুম!

—ওখানে এ সব কথা বলবেন না।

—না। চলে যাব ছোটা কোয়ার! শুধু ব্যাঙ্ক থেকে জেবরউবর বের করে নিই। দুটো দিন সময় দাও।

—কোয়ারজীকে পরনামও করব না?

—না, বাবার সামনে যাবেন না।

অমরজিতের গলা শুনে চমকে ওঠে তশীলদারনী। একেবারে কৌয়ারের মত শোনাল ধমকটা।

—আর, আপনাদের যা যা আছে, সবই নিয়ে যাবেন। ট্রাক ভাড়া করে দেব। ব্যাঙ্কে যাবেন কি, একা?

—তুমি নিয়ে যাবে?

—একা যান?

—যাই। মেয়েকে ইস্কুল পৌঁছাই। দোকানও করি। এদের বাপ তো আসত না।

ধরমবীর জামাইকে বলে, ব্যাঙ্কে সঙ্গে গেলে না?

—দরকার কি? যা নিয়েছে, যা আছে, নিয়ে চলে যাক্ না। যাচ্ছে, এতেই আমি খুশি।

তুমিও কি বিশ্বাস করো, তশীলদার পালিয়েছে?

—আমি ওর কথাই ভাবতে রাজী নই।

আর নিজের বউকে বলে, বাবার কম কাজের সাক্ষী তো ছিল না তশীলদার। ভীমদের সঙ্গে নিয়ে কি করেছে কি করে নি। সিনেমায় অমরীশপুরী যখন "ঠাকোর" হয়, সে যা যা করে, সব করেছে। বাবা নিজেই তাকে কিছু করে থাকবে, কে বলবে! যদি পালিয়ে থাকে, বউ ছেলের কাছে ঠিকই আসবে।

—যদি ধরা পড়ে?

—বাবা তাকে সিধা গুম করেও দিতে পারে।

—বলবেন না, ভয় করে।

—কি করবে বলো? প্রতিশোধ নেবে না? কিন্তু কৌয়ার সাহেবও জব্দ এখন।

—কেন?

—আমাকে মানুষই ভাবত না, তশীলদার ছিল জান সে পেয়ারা। আমি যদি জানতাম আমাকে কেউ বেইমানি করে লুট করছে, আমি তাকে···

—কি করতেন?

—অমরীশপুরী যা করে।

—বলবেন না, ভয় করে। পুরানা আদত ছেড়ে দিন। আমার ছেলেদের শাপ দেবে মানুষ, ভয় করে।

—তোমার ভয় কি ? তোমার, আমি আছি। সেই জন্যেই তো বাবার চোখে আমি না-মরদ।

—থাক্ ও সব কথা।

এ ভাবেই প্রসঙ্গটি তশীলদারের বেইমানির দিকে ঘুরে যায়। লালবদন স-মিলের চাবি অমরজিতের পায়ের কাছে নামিয়ে দেয় কাঁপতে কাঁপতে। জমিখরিদী কাগজপত্র নামিয়ে রাখে।

—জমি আমাকে তুমি নিরানব্বই বছর লীজ দেবে।

—যা হয় করুন সরকার।

—কেন ওর কথায় রাজী হয়েছিলে ?

—আমার ঘাড়ে কটা মাথা, বলুন ? তশীলদারজী আপনার বাবার লোক। তাকে আমি "না" বলতে পারি ? আমি আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাব।

—আর কিছু সম্পত্তি করে নি তো ?

—আমি জানি না। এরপর ট্রান্সপোর্টের কারবার করবে, এমন সব কথা বলত। আমি কিছুই জানি না। আমি এই দোকান, গোলা, আড়ত, হাটে দোকান, এর বাইরে কিছু জানি না। ওঃ, মনে মনে কি দুশ্চিন্তা ছিল!

হেডসিপাহীও বলে যায়, ঠিকই করেছ। এ জিনিস হজম করা যেত না।

—জঙ্গলে বসে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা যায় ?

—যা বলেছ। এখানে তো সরকারী কানুন চলে নি, চলবেও না। কৌয়ারের রাজই কায়েম থাকবে।

ও, সি সুপারকে বলে, তশীলদারদের ফাইল কি করব সার ?

—নট ফাউণ্ড ডেড, নট ফাউণ্ড লিভিং, মিসিং লোকজনের ফাইল তো খোলাই থাকে।

—ইয়েস সার।

—যে টাইমটা থেকে মিসিং. সন্ধ্যার পরও ওখান থেকে অনেক ট্রাক তো চলে।

—তা তো চলেই।

—বাস ?

—লাস্ট বাস ছ'টা উনিশে বেরিয়ে যায়।

—ট্রাক সব···

—বেশির ভাগই বাঙ্কা সাইডের।

—টিম্বারের ট্রাক ?

—হ্যাঁ সার....

—আপনারা ধরেন না কেন ?

ও. সি. নির্বাক।

—ঘুষও তো খান না।

—আমাকে বদলি করে দিন সার।

—হবেন·· বদলি হবেন...এই ইস্তাহার দেখেছেন ?

—দেখেছি। ট্রাক থেকেই ফেলে গেছে মনে হয়।

—শোষিত্ মুক্তি দল! খুব নজর রাখবেন।

মলিন হেসে ও. সি. বলে কোয়ারের এলাকায় কিছু হবে না সার। সবাই ভয় পায়। তবু নজর রেখেছি।

—সেকেণ্ড অফিসার এসে গেলে ছুটি নিতে পারবেন!

—থ্যাঙ্কু সার।

—ক্রাইম রেট কি রকম ?

—সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট, মদ খেয়ে মারামারি, লারাতু মোড়ে কিছু ছিনতাই···লো পার্সেন্টেজ!

—কোয়ারের লোকরা তোলা ওঠায় না ?

—কি বলব, সার? পালটা নালিশ করে না কেউ। তা না করলে···

—হ্যাঁ, আপনি আসুন।

ও. সি. বেরিয়ে এসে মুখ ও ঘাড় মোছে। ভজন সিং, মোতিহার যাদব, তিলক সিং, শেরদিল সিং, কৌয়ারের মস্তানদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে কে? থানা কি অ্যাকশান নেবে?

ইস্তাহার বলেছে, চোরাই লরি আটক করবে!

॥ পনেরো ॥

—ইস্তাহার বলেছে, চোরাই লরি আটক করবে! এ যখন দেখলাম, তখন আর কিছু ভাবলাম না!

—আর তুই চলে এলি!

তেত্‌রি চোখ মোছে। বরজুর দিকে তাকায় আর কোসিলাদের বলে, এর নাম বরজু ভূঁইয়া! এর নাম তো তোমাদের বলেছি। এরই ভাইপো বিশাল ভূঁইয়া, আর বিশালের বউ ছিল কুনারী ভূঁইন! কত বছর হল বরজু?

—বিশ সাল হয়ে গেল!

—নাগেসিয়ারা কোথায় খেড়ার?

—তারা টাটা আর চাকার মাঝামাঝি নয়া-খেড়া টোলা বানিয়ে নিয়েছে।

—বিশাল?

—বিশাল! সে বিয়ে করেছে। একটা মেয়ে···বড় হয়ে গেল।

—কাকে বিয়ে করল?

—টোড়ি সাইডের একটা ভূঁইয়া মেয়ে। লেবার ঠিকাদার মেয়েদের নিয়ে গেলে আমরা তখন লরী আটকাতাম।

—তারপর?

—কা করে? ঠিকাদারকে পিটাও, ড্রাইভারকে পিটাও, পুলিশ ডাকো। মেয়েদের তো বেচে দিত রেণ্ডিপাড়ায়। তো অনেক মেয়ে তুলেছি নয়া-খেড়াতেও। কাজকাম করছে কেউ, কেউ ফিরে গেছে ঘরে, বিয়ে করে নিয়েছে কেউ। এ মেয়েটাকে বিশালের সঙ্গে বিয়ে করালাম, ওর ঘর বসালাম···

কথা হচ্ছিল প্রাচীন কিল্লায়। বিন্দা সিং বলল, আপনি তো পথ দেখিয়েছেন আমাদের।

—আমি কে? অনেকজনের মদতে···অখবরওয়ালারা খুব সাহস দেয়....কাজ করে। আমি সব খবর রাখি তেত্‌রি! সতীশজী সব বলে আমাকে।

—তখন .... কত বললাম ··· বরজু! আমারও কেউ নেই আর। চল্‌ ঘর বাঁধি।

—কৈসে তেত্‌রি? তখনো আমি কৌয়ারের কামিয়া।

—যাক, ঘুরে ঘুরে এলি তো লারাতু!

—কৌয়ারের সঙ্গে লড়াই করছিস তোরা···এখন কামিয়ারা কাজ জুটিয়ে চলে যাচ্ছে···তারা টাকা নিয়ে কাজ করছে···খেড়ি বাঁধ মামলা ···নয়া-খেড়ি হল···মৌয়ার লড়াই···শোষিত্‌ মুক্তি দল···আমি সতীশ-জীকে বললাম, অব চলে বরজু! লড়াই জারি হ্যায়, কৈসে ন আয়ে?

অনল তলোয়ার বলে, টাটার সতীশ দয়াল?

—হাঁ, হাঁ। আমি তো ওর "সংঘর্ষ" প্রেসে থাকি। কম্পোজ করি, ছাপাই করি। ও তোমাদের জন্যে বই দিয়েছে। অভি কপিলজী ইধর বিট অফসর?

—হাঁ বরজু।

—বহোত সাচ্চা আদমী। খুব দরদিলা মন। তখনো ওখানে ছিল··· এ জঙ্গল ওই বানায়···

—আভি জঙ্গল কাঁহা রে বরজু।

—ছিল। কৌয়ার খেয়ে নিয়েছে। ওর ভুখ তো মেটে না। ছেলে ওর মতই হয়েছে?

—হয়নি, হয়ে যাবে।

—তু লিখিপড়ি হয়ে গেলি বরজু?

—সতীশজী পিটিয়ে পিটিয়ে শিখাল। কৌয়ারের থুথু যে চেটে নিত, সে তশীলদার লা-পাত্তা?

—তাই তো শুনছি।

—মেয়ে উঠাত আর আনত। আর কৌয়ার···দেখিয়ে ভৈয়া! লরী রুখবেন, সব করবেন, কৌয়ার কিন্তু ছোবল মারবে মেয়েদের উপর। তুমি কোসিলা খারোয়ার?

—হাঁ দাদা।

—তোমাদের জানই নেবে আগে।

—আমরা তো আমাদের ইজ্জত বাঁচাবার লড়াইও করব। যত ওদের চোট দেব, তত ওরা রুখবে।

—অনেক গ্রাম সঙ্গে আছে?

—অনেক।

বরজু মাথা নাড়ে।

—এই তো চেয়েছিলাম। পরামুর মানুষ ক্ষেপে উঠুক। শোনো শোনো ববুয়া, সতীশজী তো বলল, বরজু! তুমি চোখে দেখে এসো, তখন লিখব। বলল, তখন অত অখবরে ছাপত না। এখন বহোত অখবর। হাঁ, ঔর···

ও জামা তুলে ধুতির গিঁট থেকে পলিথিনের মোড়ক বের করে। বলে, কিছু টাকা দিল।

তারপর বলে, আমি আঁধারে ট্রাকে চেপে এসেছি। মোহনলাল সার্ভিসে রাতে যেদিন পরবীন ড্রাইভার থাকবে···কপালে কাটা দাগ। লম্বা, রোগা, ও আমাদের বিশ্বাসী লোক। সতীশজী ওকে কাজ করে দিয়েছে···সরকারী কাজ করত··পলিটিস করে সব ছেড়েছে···ওকে খবর দিলেও পৌছে দেবে। আর ইস্তাহারও ছড়িয়ে দেবে। এক গিলাস পানি;

জল খেয়ে ও বলে, আমাকেও তো থাকতে হবে তোমাদের সঙ্গে। নইলে আমি রিপোর্ট করব কি করে?

তেত্‌রি বলে, তু ইধরহি ঠার যা বরজু। নয়া-খেড়িতে যাস না।

—কৌয়ারের জঙ্গল এখনো আছে, না?

—হাঁ বরজু।

—আর মস্তান কে কে?

—তিন রাজপুত, ভজন, তিলক, শেরদিল, আর মোতিহার যাদব।

—শেরদিল। মোতিহার।···ঔর খেড়া?

—পড়ে আছে সে রকমই।

—যা তোরা।

অনলদের বলে, আমি শুয়ে যাই ববুয়া। এখন আমি তোমাদের। যা বলবে, শুনব।

—সব অখবরে প্রচার দেব আমরা, কিছুটা লড়াই এগিয়ে যাক।

—হ্যাঁ···সে কথাও তো ঠিক। ববুয়া। কোনোদিন ভাবিনি, খেড়া গ্রামের বরজু ভুঁইয়া তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে···সতীশজীর সঙ্গ পাবে···পালামৌয়ের মাটির নিচে নাকি কত কি আছে। কিন্তু কোনো ইণ্ডাস্ট্রি নেই। বাঁচার কোনো সাহারা নেই, থাকলে মানুষ কখনো কামিয়া হয়ে যায়?

—সামন্তী শোষণ, দাদা।

—আদমখোর কি একা কৌয়ার? সব ঠাকোর, বরাম্ভোন মালিকরা। আদমখোর। তবে হাঁ, কৌয়ার সবার ওপরে।

বলেই বরজু নিমেষে ঘুমিয়ে যায়। বিন্দা সিং বলে, এমন সব মানুষ সামনে আসুক, তাই তো চাই।

—তাই দরকার।

—যে জমিতে কোনদিন চাষ পড়েনি, সেখানে বীজ ফেললে তাড়াতাড়ি চারা গজায়।

—বিশ বছর আগে ওই তো সব খবর দিয়েছিল পাটনা গিয়ে। সাহস ছিল, আর মনের আগুনে জ্বালতে জ্বালতে সাহস জন্মেছিল।

—সতীশ ছেপেছে বই?

—হ্যাঁ। "শোষিত্‌ মুক্তি দল"-এর কথা।

—এবার লরি আটকাব।

কৌয়ার বলেন, এ ইস্তাহার দেখেছেন আপনি?

—দেখেছি।

—তবু কোনো অ্যাকশান নেননি?

ও. সি. বলে, চোরাই কাঠের লরি আটকানো কোনো অপরাধ নয়। আর যে কাজ হয়নি তার বিরুদ্ধে কি অ্যাকশান নেব?

—থানা কোনো কাজ করে না, আমার সারাতুতে তো এ আমি বরদাস্ত করব না।

—আমিও ট্রান্সফার চাইছি। আপনি আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিন, আমি খুশি হব।

—আমি বলছি, এসব নারী মুক্তি দল, শোষিত্ মুক্তি দল, এসব একটা মুখোশ। নয়া-খেড়িতে নিশ্চয় কোন অন্য রকম দল জুটেছে, অন্য কাজ হচ্ছে। যান, দেখুন সেখানে।

—শুধু সন্দেহের ওপর আমি গ্রামে হামলা করতে পারি না।

—আমি পারি, করে দেখাব।

বাড়িতে কৌয়ার ফেটে পড়েন অমরজিতের ওপর।

—আজ তশীলদার থাকলে ওই নয়া-খেড়ির লোক আমার কাছে ভিক্ষা চাইত। মেয়েরা দল করবে, মৌয়া তারা বেচবে, এসব স্পর্ধা হতেই পেত না। তুমি কি চাও, আমি বুঝি না। সাধে তোমায় না—মরদ বলি?

—স-মিল হাসিল করল কে?

—করেছ যেমন, তেমন অন্যে মাল দেবে বলে বসে আছ কেন?

—কি করতে বলেন?

—জঙ্গল কি নেই?

—ওই জঙ্গল? কিসের জঙ্গল? একটা জানোয়ার নেই, পাকা গাছ নেই! গাছ তো আপনার আছে।

—আরে মূর্খ, আমার জঙ্গলের দাম জানো?

—জানি, আমি হিসাব করেছি।

—তাই নাকি?

—দেখুন, গাছ সম্পত্তি মাত্র। পঞ্চাশ বছর বাদে এর দাম কত হবে, তা জেনে আমার কি হবে? তখন আমি থাকব না। আমি এই জীবনে ভোগ করতে চাই।

—ভোগ করবে? "ভোগ" করবে তুমি? তুমি জানই না জীবন কিভাবে ভোগ করতে হয়।

—আপনার আর আমার আইডিয়া একরকম নয় পিতাজী। আমি আপনার জমিজিরাত, জঙ্গল, সব অ্যাসেটকে টাকায় দেখতে চাই।

—তারপর?

—বিজনেস। হোটেল, সিনেমা, লাকসারি ট্যাক্সি, কত কি করার আছে।

—পালামৌয়ে? হাসালে তুমি।

—রাঁচি, ধানবাদ, টাটা, দিল্লী, বম্বে, দেশে শহরের অভাব আছে কিছু? এই গেঁয়ো টাউনে পড়ে থাকতে হবে?

—যাও, যাও তুমি। আজ তশীলদার থাকলে···

কৌয়ারের গলা ঘরটাকে কাঁপিয়ে দেয়। ছুটে আসে শেরদিল সিং।

—মালিক পরোয়ার।

শেরদিল সিং! শেরদিল কোনোদিন তশীলদার হতে পারবে না। তশীলদার বেইমান হয়ে গিয়েছিল। শেরদিলও কি বেইমান হয়ে যাবে? না। তিজৌরি হাতে না থাকলে বেইমান হবার লোভ জাগে না।

কৌয়ার চাপা গর্জনে বলেন, সব যেন ঘুমিয়ে পড়েছ তোমরা। মুলুক সিংকে পাঠাও। গারোয়া থেকে চাঁদ সিংকে ডেকে আনুক। হাঁ হাঁ, আমিই তাকে উকিল করেছি, সে তেমন পসারও করতে পারেনি। সে কাছারিতে বসবে।

—জী হুজুর মালিক!

—দুর্জন সিং ছোটা কাছারির হিসাব নিয়ে আসুক গাইবানী থেকে।

—আমি নিজে যাব।

—তুমি যাবে না, লোক পাঠাও। আর চন্দ্রভান তিওয়ারিকে ডাকাও লাতেহার থেকে। ওখানে কাছারি দেখতে তার ভাই পারবে। তিওয়ারি চাঁদ সিংকে কাজ বুঝাবে।

—যো হুকুম মালিক।

—লাতেহারে জগন সিংকে জানাও, তশীলদারের শালার বাড়ির উপর সর্বদা নজর রাখে। তশীলদার এলেই তাকে তুলে আনবে।

—ভীম সিং, ওরা···হুজুর?

—তাদের আনার দরকার নেই। বেইমানকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। তবে তশীলদারের কথা আলাদা। ওকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখব।

—যো....হুকুম মালিক।

তশীলদার রোহিত সিংকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। রোহিত একদিন কিশোর রাওলকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ··জঙ্গল সব জানে। আর আমার ছেলে এ জঙ্গল বেচে দিতে চায়! আর পরশু থেকে আমি জমিদারীতে ঘুরব, তুমি সঙ্গে থাকবে।···ঠিক আগেকার মত!

শেরদিল নত হয়ে ওঁর নাগরা ছোঁয়, হাত জোড় করে ও গভীর আবেগে বলে, মালিক! মালিক। এসব কথা শুনব বলে কতদিন বসে আছি। এ লারাতু আপনার তৈরি মালিক। "লারাতুর কৌয়ার" নাম শুনলে মানুষ দৌড়াবে, আওরত চেঁচাবে, বনের বাঘ গর্তে ঢুকে যাবে, এহি তো লারাতু।

কৌয়ারের চোখ কোনো অমানুষী তেজে জ্বলতে থাকে।

—মাটি রক্ত চায়, জঙ্গল রক্ত চায়, আমার ছেলে তা বুঝে না। রাজপুতরা মুঘল শাহীর দিনে চেরো রাজাদের ফৌজে ঢুকেছিল আর পালামৌতে পা রাখে। তারপর অংরেজ রাজপুতদের রাজ বেটে দিয়েছিল। প্রতি রাজবংশের ইতিহাসে অনেক রক্ত আছে। অছুত আদিবাসী, কামার-কুমার, সবাইকে দাবিয়ে পিষে রেখেছে রাজপুত, জমি-ভূমি-জঙ্গল-পাহাড়ের মালিক রাজপুত। আর এটাই ধরমরাজ এখানে। পুলিশ কি করবে? এত চীৎকার কেন? কে গড়ছে নারী মুক্তি দল আর শোষিত্ মুক্তি দল? শুকনা ঘাসে আগুন জ্বলছে শেরদিল, যদি এখনি না দাবাই, তাহলে দাবানল জ্বলে যাবে।

—মালিক।

শেরদিলের মনে হয় কৌয়ারের উপর কোন অমানুষী শক্তি ভর করেছে।

—কুনারী ভূঁইন একা নয়। অনেক, অনেক অছুত মেয়ের রক্ত আমি লারাতুর মাটিতে দিয়েছি···এই জঙ্গলে। মাঝে মাঝে আমার রক্ত ভুখা হয়ে ওঠে, তখন আমি বুঝতে পারি···কুনারী ভূঁইনকে সপন দেখি যখন। তখন বুঝতে পারি।

—আপনি···সপন···দেখলেন?

—হাঁ শেরদিল। কুনারী কোনো সঙ্গী চাইছে। আমিও তো সেই থেকে বসে গেছি, না? কিন্তু এখন আমি সব ঠিক করে দেব। সব এনে ফেলব হাতের মুঠোয়, হাঁ।

হাতের মুঠ মেলে ধরেন।

—এইসব ইস্তাহার মানে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ আমি বরদাস্ত করি নি, করব না। সব ঝুঝার আর খেড়া করে দেব।

কৌয়ার বলেন, আভি যাও।

লম্বা হলঘরের শেষ দেয়ালে পিতৃপুরুষদের ছবি। সেদিকে চেয়ে থাকেন কৌয়ার। বুঝবে, অমরজিৎও একদিন বুঝবে। কৌয়ারের বাবাও তো তাঁর বাবার জীবিতকালে কোনোদিন ভাবেন নি রাজ্য চালাবার কথা। ঘোড়া কিনতেন, ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচাতেন। কিন্তু যেদিন গদীতে বসলেন, সেদিনই পালটে গেল সব।

লারাতুর কৌয়ার মহল খুব কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। চন্দ্রভান তিওয়ারি কাছারিতে বসে চাঁদ সিংকে নিয়ে। দেওয়ালে গাঁথা আলমারি থেকে বেরোয় দলিল, দস্তাবেজ, হিসাবের খাতা, কামিয়াদের টিপছাপ সংবলিত দাসনামা।

কৌয়ারের ঘরের তিজোরি খুলে টাকা গোনা হয়। মুলুক সিং, গর্জন সিং, দোয়ারা সিং, মথুরা সিং, কৌয়ারের একদিনের অনুগত সিপাহীরা যে-যার ছেলে, ভাইপোকে নিয়ে আসে।

অনেককাল পরে আস্তাবলে ঘোড়া দেখা যায়। নতুন মোটর-সাইকেল আসে দুটো। আর্মারি থেকে বন্দুক দেয়া হল যোদ্ধাদের।

সন্ত্রস্ত কপিল শ্রীবাস্তব সরস্বতীকে বলে, আমার ভালো মনে হচ্ছে না ব্যাপার-স্যাপার।

—কেন?

—কৌয়ার একটা কিছু ঘটাতে চলেছে।

—তখনকার মত?

—হ্যাঁ।

—তুমি আর আমি ভেবে কি করব?

—ভাবনা তো আমার হাতে নেই।

—তুমি দেখেছ, বটগাছটা কেমন সুন্দর হয়েছে?

—রিটায়ার করলে স—ব টাকা দিয়ে রাঁচিতে একটা বন্‌সাই দোকান করব।

—কেন গাছগুলো সুন্দর হচ্ছে জান তুমি?

—বাজনা শুনে।

—সত্যি, বাজনা শুনে ওরা খুশি হয়।

—এবার একটা ছাতিম গাছকে বন্‌সাই করব।

অমরজিৎ গভীর সন্দেহে বলে, কি করতে চলেছেন আপনি।

—তোমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা।

—এরা কেন এসেছে?

—এদের মত বিশ্বাসী লোক পাবে কোথায়? আমার পর তোমাকে দেখবে কে? ওই শার্টপ্যান্ট পরা, জুলপিওয়ালা তিন পয়সার চামচার দল? এরা সব সুরজবংশী রাজপুত। এরা দেখবে।

—পিতাজী।

—খুশি থাকো বেটা। আমি এতদিন ভুল করেছি, এখন আর ভুল করব না।

অমরজিৎ উঠে যায়। বউকে বলে, বাবা আমাকে বিশ্বাস করে নি, করবে না। আবার কতকগুলো গুণ্ডা এসেছে।

—যা ইচ্ছে করুন। আমি আর আপনি চলে যাব।

—নিজের পাওনা বুঝে নেব, তবে লারাতু ছাড়ব।

মোটরসাইকেলে কৌয়ার, আরেকটি মোটরসাইকেলে শেরদিল সিং ঘুরতে থাকেন, ঘুরতে থাকেন। ঝুঝারের কাছারিতে ডাক পড়ে কামিয়াদের।

কৌয়ার বলেন, একটা পরিবার কাজের খোঁজে বাইরে গেছে শুনেছি তো এখানে কেটে রেখে যাব। বহোত্ সহ্য করেছি, আর সহ্য করব না। মুনিম!

কাছারির মুনিম দৌড়ে আসে দৌড়ে আসে সেপাইরা।

—ঝুঝারে কি দিই নি? কুয়া দশটা, ডিজেল পাম্পে জল উঠছে, হালবলদ আছে, এতগুলো কামিয়া মরদ আওরত আছে, ফসল কমে যাচ্ছে কেন?

—খাদান যদি দিতেন হজৌর।

—খাদান! খাদান চেয়েছে?

—চাষের খরচও বেড়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ! এখন ওরা টাকা নেয়। দাও টাকা। কিন্তু বারো ঘণ্টা কাম উস্থুল কর লো। যে করবে না তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। মনে থাকে!

সবাই নীরব। কিন্তু কামিয়া মরদ আওরতদের মাথা নিচু নয়। ওরা সোজা কৌয়ারের দিকে চেয়ে আছে।

—কাছারিতে নারীমুক্তি দলের ইস্তাহার কে লাগাল? বল্, তোদের মধ্যে কে লাগিয়েছে?

কৌয়ার, মুনিম ও শেরদিলকে স্তম্ভিত করে পঞ্চাশ ষাটটি মেয়ে এগিয়ে আসে।

—হম লাগাই।

—হুম লাগাই।

—হুম লাগাই।

সবাই বলে, হুম লগাই।

কৌয়ার গর্জে ওঠেন, সবাই লাগিয়েছিস? আওরতরা? বহোত শাবাস। আওরতরা অনেকদিন দাওয়াই পাস না। সেপাইগুলো না-মরদ হয়ে গেছে। আমিও পরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম। শুনো আওরত লোগ! ছোটলোক, ছোট জাত, আর আদিবাসী আওরত একই দাওয়াই বুঝে।

কোসিলা বিরজাইন মাথা নাড়ে।

—কুনারী ভুঁইনের দিন চলে গেছে কৌয়ার! এখন আর আমরা ইজ্জত দেব না, কেড়ে নিলে দাম নেব। ওসব দিন ভুলে যান।

—তোকে কে দাওয়াই দেবে? বুড়ি ভৈঁসী তুই? দিন চলে গেছে কি না কয়েকদিনে বুঝিয়ে দেব। মুনিম! সব ইস্তাহার ছিঁড়ে ফেল। যদি আবার লাগায়, তো আমার হুকুম, বকরির মত টেনে নিয়ে যাবে জওয়ানী আওরতদের। আর, আমি আবার আসব। একবার ঝুঝার জ্বলেছিল। আবার ঝুঝার জ্বলবে!

কৌয়ার বেরিয়ে যান মোটরসাইকেল নিয়ে।

কোসিলা মুনিমকে বলে, সেপাইদের শুনিয়ে।

—মন দিয়ে কাজ করো মুনিমজী, ইস্তাহার ছেঁড়ো।

—আরে কোসিলা! নিজের কাজে যা না!

—তাই তো যাচ্ছি। এ ঝুঝাওয়ালা লোক। মুনিমের হাতে চাবুক নেই, সেপাইরা দাঁড়িয়ে আছে, এমন দৃশ্য দেখেছিস কখনো?

—এখন তো দেখি।

—কেন দেখিস? কেন না কামিয়া লোক হরদম ভাগছে। এ কথাটা ভাবা দরকার।

—যা যা, কাজে যা।

—সে তো যাব। কিন্তু এখন ক'ঘর কামিয়া নেই, তুমি ভাল করে জানো।

—জানি।

—কম লোককে দিয়ে বেশি লোকের কাজ আদায় করছ! তবে বেশি টাকা দাও।

—বড় বড় কথা বলছিস।

—বলব না? না দিলে সব ভাগবে। তখন কৌয়ারকে কি বলবে?

—নইলে কাজ করাবি না?

—আমি তো করব না।

—কামিয়া লোকের এমন কথা!

—কামিয়ৌতি তো করাতেই পারে না। থানাকে ডেপ্‌টিশান দিয়ে দেবো আমরা। যে গৈরকানুনী কাজ করছে।

—অনেক হয়েছে, এবার যা!

—বেশি টাকা!

ওরা চলে যায়। সেপাইরা বলে, আওরৎ নিয়ে টানাটানি করতে এখন সাহস হয় না। সেদিন ফুলিয়াকে বললাম, মরদ ঘরে নেই, তোর কষ্ট হয় না? বলল, খুব কষ্ট। রাতে এসো, সব কথা বলব।

—আর আঁধারে মাথায় পাথর খেলি?

—হুঁ মুনিমজী।

—কিন্তু আওরতের তো আর দাওয়াই নেই!

—কিন্তু, ঝুঝার বাজারে তো ফরেসের ক্যাম্প পড়েছে।

—দেখতে হবে ভোগীলাল! কোনো উল্টা হাওয়া চলছে ঝুঝারে। এ ইস্তাহার কারা লাগাল তাও জানি না। রাতে বেরোতে সাহস পাই না। তশীলদারদের মত লোকরা যদি লা-পাত্তা হয়ে যেতে পারে…

—ওরা তো বেইমানি করেছিল।

—তাও জানি না।

—কৌয়ার দশবার এলে গেলে সব সিধা হয়ে যাবে। কত বছর ঘুরেন না জমিদারীতে।

—হাঁ, কৌয়ারই ভরোসা।

কাছারির উঠোন উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বিরাট উঠান, মাটি লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। এখানে ঝাড়াই বাছাই হয়ে শস্য ওঠে ঘরে। সার সার ঘর। উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে কয়েকটা বুড়ী।

মুনিম বলে, আগে ছোট ছেলেরা কাজ করত এসব। এক মুঠা ভুট্টা পেত, কি পেত না! এখন তারা ইস্কুলে যাচ্ছে!

—এত রোড, এত বাস, এত রেললাইন। বাইরের হাওয়া তো ঢুকে গেছে ঝুঝারেও। মানুষ কাজও পাচ্ছে, পালাচ্ছে!

মুনিম অন্যমনস্ক ভাবে বলে হ্যাঁ··· ডেভলপমেন্! তখন জঙ্গল ছিল কত! ঝুঝার যখন জ্বালিয়ে দিল, কত লোক পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। জঙ্গল কেটেছে আর চালান দিয়েছে এরা···এখন তো শুধুই ধাক্ গাছ। জ্বালানি হয় আর পাতা ছেঁড়ে। লাক্ষা চাষ হত, স–ব বন্ধ।

—বাজার থেকে তো সরকারী ইলাকা শুরু হল।

হ্যাঁ। যা, কাজে যা।

কোসিলা কাজ করে না, বসে থাকে। কালো থান পরনে, কালো জামা, রুক্ষ চুলে ঝুঁটি, গলায় দস্তার চেন। পালামৌয়ের মাটি কৃপণ? মাটি বেইমান, বেইমান, বেইমান! নিয়মিত জল ও সার পেয়ে কৌয়ারের জমিনে ধান দেখ কত! এই ধান পাকে, কাটা হয়, কাছারিতে ওঠে। যায় ধানভাঙা মিলে, যায় বাজারে। এ সব জমি কবে বিরজিয়া, নাগেসিয়াদের ছিল?

ফুলিয়া কাছে আসে, এ মৌসি?

—কা রে?

—শরীর খারাপ লাগছে?

—শির দুখাচ্ছে, ঘরে যাই।

ঘরে গিয়ে কোসিলা মাচায় ওঠে। মাচানে ও ঘুমায়! নিচে থাকে ছাগলছুটো। চালের ঘাস সরিয়ে দেখে। না, যে ইস্তাহার বেঁচেছিল, তা গোঁজাই আছে। আর কারো ঘরে রাখে নি কোসিলা, আর কারুকে

বিপন্ন করে নি। তারপর চালের বাতায় গুঁজে দেয় ঘাসের চাট্টি। আতিপিতি কলসি ভরে আনে। সূর্যটা ডুবুক, তারপর ও দৌড়বে আর দৌড়বে। রিপোর্ট করে দেবে তেত্‌রিদের : লরি আটকিও পরে। এখন আওরতদের ইজ্জত বিপন্ন। কোয়ার ময়দানে নেমেছে, আবার শিকার খেলা শুরু করবে।

সূর্য ঢলতেই ও দৌড়ায় গন্নু বিরজিয়ার ঘরে। গন্নুর বউ দশদিন হল ছেলে বিইয়েছে, এখন ঘরে আছে। ও ঢুকে পড়ে ঘরে।

—এ পারো।

—কা মৌসি?

—গন্নু ঘরে এলে বলবি, আমি রিপোর্ট করতে গেলাম। গন্নু বুঝবে কি রিপোর্ট। আর এও বলবি, আমি রাত যত হোক ফিরব। আর সব আওরত যেন মরদদের সঙ্গে মাঠ থেকে ফেরে! গন্নু যেন ঘরে ঘরে খোঁজ নেয়।

—তুই একা যাবি?

—হাঁ।

—রাতে···

—আকাশ পরিষ্কার। তারার আলো আছে

—ঠিক আছে।

ঝপ করে হঠাৎ নামে সন্ধ্যা। আশ্বিনেরও শেষ, বাতাস হিমেল, ধান পাকবে বলে প্রস্তুত। কোসিলা আল ধরে, গো-পথ ধরে ছুটে চলে।

তেত্‌রি অবাক হয়ে যায় ওকে দেখে।

—কি হয়েছে?

—কোসিলাকে···ডাকো···আর কাউকে নয় · একটু·· দম নিই··· এক ঘটি জল দিয়ে যাও।

তেত্‌রি বলে, বোস্ তুই।

কোসিলা চলে আসে নিমেষে।

—কি হয়েছে?

ঝুঝারের কোসিলা বলে, খুব···বিপদ···শিগগির যাও, ওদের বলো, লরি আটক পরে হবে। এখন অন্য খতরা। আজ কৌয়ার এসেছিল ··

ও সবই বলে যায়। আবারও জল খায়।

—আমি চলি।

—এখন? আঁধারে?

—টর্চ তো কোনোদিন ছিল না। আজ আমিই মুনিমের সঙ্গে চড়া চড়া কথা বলেছি···কৌয়ারের সঙ্গেও···পাঁচটা ইস্তাহার আমারই ঘরে। আমি না গেলে ওরা সন্দেহ করবে। মুনিমকে জানো না, ও আঁধারে সাপের মত নীরবে আসতে পারে। ভোরে কাজেও যাব।

আরেক ঘটি জল খায় কোসিলা। দরজা খুলে আঁধারে মিলিয়ে যায়।

তেত্রি বলে, আমি যাই।

—পুরুষরা যাক কেউ?

—সব ঢোল বাজাচ্ছে, গান গাইছে, কাকে ডাকবি? তাকে বুঝাব·· বলব···

—এই আঁধারে?

—পথ তো আমি চোখ বুজেও যেতে পারব। আর···এখনো একবারেই সুঁচে সুতা পরাই···যা তুই। নইলে মুশকিল হয়ে যাবে। কৌয়ার এ গ্রামেও আসবে।

—এ কি তার জমিদারী?

—বই পড়লে এমন উল্টা বুদ্ধিই হয়। সবাই আসতে পারে, সে পারে না? দাঁড়া!

—টরচ নাও।

—কি বুদ্ধি। টর্চ জ্বালব তো লোকে দেখে ফেলবে না?

লাঠিটা নেয় তেত্রি, বাঁকে বাঁকে লাঠি ঠুকে পথ দিশা করে নেবে। বুকে ভীষণ চাপ। গ্রামে গ্রামে জানান দিতে হবে। সবচেয়ে আগে জানাতে হবে, যে লরি অবরোধ কার্যসূচী পরে। কৌয়ার অন্ত, আদিম যুদ্ধ-পর্ব সূচনা করছে।

সব শুনে বরজু বলে, কোসিলা বিরজাইনের উপর রাগ থাকবে ওদের।

তেত্রি বলে, বরুয়া! বরজু বলবে, কৌয়ার কেমন জানোয়ার। কা বরজু নায় ?

—হ্যাঁ···কৌয়ার শাসাবে···অত্যাচার করবে···আবার ওর লোক-জন অন্ধকারে পুলিশের কুত্তার মতও ঘুরবে। ও তো পাকা শিকারী।

বরজুর চোখ অতীতে চলে যায়, গলা ধীর ও মন্থর হয়, ও এভাবে হাল্লা তুলে, অত্যাচার করে বের করতে চেষ্টা করছে, মানুষকে সাহস জোগাচ্ছে কারা, শোষিত্ মুক্তি দল, নারী মুক্তি দলের পিছনে কারা আছে। মানুষ সচেত্ ঔর জাগ্রত্ হয়ে গেলে ওর বিপদ, বিরাদরির বিপদ। তাই এত লড়াইয়ের সাজ। এই মালিকদের মধ্যে ধরমবীর অ্যাডভোকেট ঔর লিখিপড়ি লোক, কিন্তু বুদ্ধি কৌশলে কৌয়ার সবার উপরে যায়। এক সময়ে জঙ্গলে আগুন দিয়ে শিকার বের করত ··ঔর হরিজন—আদিবাসী আওরতের মাংসের ভুখ্ তো ওর আছেই। লালচ্ উঠলে ও আদমখোর। আর ওহি আওরত্কে কে নেবে, যাকে উঠালে তোমরা ক্ষেপে বেরোবে!

—অব কা করে বরজু ?

—অব গাঁও-সে-গাঁও পাত্তা পহুঁছনা জরুর, আমার তো তাই মনে হয়। ববুয়ারা বলুক!

বিন্দা সিং বলে, হ্যাঁ···তাই। তু ঘর যা মৌসি! পৌঁছে দেব ?

—না, কেউ এসো না। কাল আমি নাড়া যাই। ননদের ঘর।

—তোর ননদ ?

—আরে দুখারির মা। দুখারি তো সাইকেলে গাঁয়ে গাঁয়ে মলম—তেল বেচে। ও খবর দিতে পারবে কিছু।

—আর ?

—আর গাঁওলি মেয়েরা যাক একেক গাঁয়ে ননদ, কি বোন, কি মেয়ের, কি কুটুম বাড়ি ?

বিন্দারা বোঝে, পরিস্থিতিতে পড়ে তেত্রি কি রকম কৌশলী

লড়াকু হয়ে গেছে। বরজুর কথাই যে ঠিক, তাতেও সন্দেহ থাকে না ওদের।

—আব চলে হম্।

—সাবধানে যেও মৌসি।

—যাও, তোমরা যাও।

বরজু বলে, বুরা লাগছে?

ঈষৎ হেসে অমল বলে, হ্যাঁ···আমরা সামনে যাচ্ছি না। মৌসি··· মেয়েরা··

—এখনই সামনে বেরোও, তো কৌয়ারের জিত হয়ে যাবে। পুলিশই অত্যাচার চালাবে, লোক মারবে, উগ্রপন্থী ধরে মেরে পুলিশের খুব উন্নতিও হয়। আন্দোলনের চেত্না সবে ছড়াচ্ছে, মানুষ সাহস পাচ্ছে, এখনি শহীদ হয়ে গেলে কাজ আগাবে, না পিছাবে?

—ভাবছি।

—আমরা তো চাই না, জাগতে না জাগতে ধানের চারা পিষে যাক। মেয়েরাও চায় না। তাই তো এগিয়ে আসছে। এখানে মেয়েরা এই প্রথম লড়ার মৌকা পাচ্ছে, নষ্ট করে দিও না। আর···

—আর কি?

—আমি জানি আওরত উঠালে কৌয়ার কি করবে।

—ইজ্জত নেবে।

—আগে শিকার খেলাবে, সেও ওর জঙ্গলে···ওর বাড়িতে নয়। চলো শুয়ে যাই।

তেত্রি সকালে কোসিলাকে বলে, হম্ চলে নাঢ়া।

—ধাক্ পাতা কে তুলবে? পাতলি কে বানাবে?

—ক'দিন ঘুরে আসি।

নাঢ়াতে তেত্রি পৌঁছয় যখন, তখন কৌয়ারের লোক শেরদিল ও জগন সবে নাঢ়া থেকে বেরোচ্ছে। তেত্রিকে দেখে ওরা মোটর সাইকেল থামায়।

—আরে তুই কে ?

—তেত্‌রি ভূঁইন, মালিক পরোয়ার।

—কোথা থেকে আসছিস ?

—পাস্‌কি থেকে হজৌর।

—যাচ্ছিস কোথায় ?

—নাঢ়া যাব হজৌর।

—কার কাছে ?

—মোংলি ভূঁইন্‌ হজৌর···আমার ননদ লাগে....তা আসতেই পারি না···একটু আরাম করব, দু'দিন গল্প করব···

—কোন মোংলি ?

—ওই যে হজৌর, এক পা খোঁড়া···

—যা, তোর ননদ দাওয়াত সাজিয়ে বসে আছে।

দুজনেই চেঁচিয়ে হাসে ও ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। তেত্‌রি হাঁটতে থাকে।

মোংলি বলে, নে, বোস্‌।

—এক ঘটি জল দে।

—আগে জিরা খানিক।

—দুখারি কোথায় ?

—সে তো ভোরে বেরোয়, বিকাল পেরিয়ে আসে। বাপ্‌ রে, এতক্ষণ যা হচ্ছিল।

—হ্যাঁ, ওদের দেখেছি রাস্তায়।

—অব্‌ কা হোই ?

—সব ফিরুক মাঠ থেকে, কথা হবে।

—কি খাবি বল্‌ তো ?

—সত্তু আর আচার এনেছি। দুজনেই খাব। চামারী দুসাদিন কোথায় ?

—মাঠে, আর কোথায় ?

—সন্ধেবেলা কথা হবে। সত্তু মেখে ডাকিস। একটু ঘুমাই।

খুব থকে গেলাম বাপ্‌রে। আগে এতখানি পথ হেঁটে এসেও বাজারে যাচ্ছি, মশলা ঝেড়ে সাফ করেছি, পয়সা নিয়ে আটা কিনেছি, ঘরে এসে লেট্টি সেঁকেছি, কি করে পারতাম ?

ঘুমিয়ে পড়ে তেত্‌রি। ঢুখারি তেল-মলম বেচে কামিয়ৌতি থেকে বেঁচে গেছে, কেন না ঝুঝারের মুনিমের বৈবাহিকই বৈদ্যাচার্য। তাঁর তৈরি তেল ও মলমের সেল্‌সম্যান ঢুখারি। সে হাটে বাজারেও এসব বেচে বেচে লোকাল মার্কেট কব্জা করে ফেলেছে। ঢুখারির বউ ছাগল পালে। ওদের ঘরে নিত্য উনোন জ্বলে। অঞ্চলে আর কোনো ভূঁইএগ এত উন্নতি করে নি।

সন্ধ্যায় ঢুখারি ও চামারি ঢুসাদিনকে তেত্‌রি বিপদের ভয়ঙ্করতা বোঝায়। চামারি বলে, সে কোকারে যাবে বোনকে দেখতে। এবং কোকার থেকে কুন্তী নাগেসিয়া যাবে গাইবানী। ঢুখারি কথা দেয় ও চৈতপুর এবং মাকাপুরা যাবে কালই। এবং ছগনি ভূঁইনকে খবর যাতে দেয়া হয়, সে ব্যবস্থা করে ফিরবে।

তেত্‌রি বলে, আজ কি কেউ এদের সঙ্গে গরম গরম বাত করেছে ?

চামারি বলে, আমি বলছি, আওরতের ইজ্জত কেন, কিছু নেবে, তো আমরাও দাম নেব।

তেত্‌রি মাথা নাড়ে। বলে, সে তো ঝুঝারেও বলেছে। কিন্তু সব রুখা রুখা কথা আর যেন কেউ না বলে। সাপ ছুতো খুঁজছে, ছোবল দেবে।

—ছোবল দিলে ?

—মেরে দেব, সবাই শোর উঠাব, থানায় হাল্লা তুলব, আমাদের আওরতের কি ইজ্জত নেই ? ইজ্জত নিলে মার খাবে, মরতে হবে। অনেক, অনেক সহ্য করেছে পলামুর আওরত, আর সহ্য করব না।

—ওরা মারবে।

—ঢুখারি, ওরা মারে নি কবে ? এখন থেকে নয় মেরে মরব ?

—ঠিক কথা।

—মাঠে যাক, জঙ্গলে যাক, জওয়ানী আওরতদের নিয়ে যেন ঘরে আসে মরদরা।

তুখারি তেতে বলে, আমার বউকে বলো সে কথা? সে তো আঁধারে জল আনতে চলে যায়। কি? না ওর কোমরে বিছুয়া আছে!

তুখারির বউ বলে, যাও, তুমিই জল আনো।

—দে কলসি।

মোংলি বলে, জল মরদরা আনে তো ভালই। কুয়াতলা থেকে তো কম মেয়ে তোলে নি।

—সব জায়গা থেকে তুলেছে। মাঠে টাট্টি ফিরতে যাও, বাজারে যাও, ঘরে থাকো!

তেত্রি বলে, ইস্তাহার ছিঁড়তে বলেছে?

—বলেছে।

—কারো কাছে থাকলে লুকিয়ে রাখুক। এখন ছিঁড়লে এখনি লাগাবার দরকার নেই। বাস্, কাল আমি যাব।

—কাল কৌয়ার আসবে নাঢ়া।

—হ্যাঁ ··সে তো ঘুরছে···

কখনো শেরদিল, কখনো ভজন, মোতিহার, তিলক, দুর্জন, চন্দ্রভান, মুলুক, গর্জন, দোয়ারা, মথুরা, সকলকে নিয়ে ঘুরতে থাকেন কৌয়ার!

নয়া-খেড়ির ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল চলে যায় বারবার। শেরদিলকে জিজ্ঞেস করেন, কি রকম বুঝছ?

—পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—কি রকম?

—জোয়ান মেয়ে বউ সব জঙ্গলে যাচ্ছে, ধাক্ পাতা ভাঙছে। পাত্তল বানাচ্ছে, বেচতে যাচ্ছে।

মৌয়া ও বিড়ি পাতাকেই বনজ ফসল বলে জানতেন কৌয়ার, ধাক্ পাতা যে বনজ ফসল হতে পারে, এ ভাবেন নি।

—পাত্তল বেচে পয়সা হয়?

—কেন হবে না হজৌর? সবাই খায় পাত্তলে, আর এখন বাজার

যত, লোক তত, লারাতু মোড়েই পরপর পাঞ্জাবীদের দোকান, ওরা সমানে কিনছে।

—জঙ্গল না সরকারের?

—সিবাস্তব তো পোরমিট দিয়ে···

—আচ্ছা! কপিল শ্রীবাস্তব! পোরমিট দিচ্ছে! লোকটা একটা পাপী! বিধবাকে বিয়ে করেছে! কিন্তু এ তো খুব ভালো কাজ, আওরতদের···পোরমিট দিচ্ছে···। পোরমিট নিয়ে তবে সব যাচ্ছে ফরেসে!

—আগে তো কেউ পোরমিট-উরমিট জানত না।

—এখন জানে। কবে থেকে জানলাম? মৌয়ার মামলা থেকে! মৌয়ার মামলা কবে থেকে শুরু হল? যবে থেকে নয়া-খেড়ি পত্তন হল। নয়া-খেড়ি পত্তন করল কারা? যারা খেড়ি বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি করেছিল। সমিতি কা কিয়া? সরকারের খিলাফে কেস কিয়া! আরে বাপ্‌রে! সুপ্রীম কোর্ট তক্ কেস কিয়া! সমঝ লো শেরদিল, বিরাদরিতে কেউ আজ অবধি সুপ্রীম কোর্ট তক্ নেহি লড়া।

—বাটান ইস্টেটের রণধীর সিংজী লড়েছিল।

—আরে কমবখত! সে তো রণধীরের ছেলে নিজে আওরতকে জীন্দা জ্বালায় বলে কেস হল! মেয়ের বাবাই জজ, ভুলে যেও না! কিন্তু খেড়ির লোকরা? আদিবাসী! স—ব ভোগতা, বিরজিয়া, খারোয়ার লোক? ঔর কেস জিতে নিল। ঔর টাকা পেল কমপেন-সেশান! এই ভারত সরকার উঁচা জাতের মুখে জুতা মারল। কেঁও কি, বাঁধের জন্যে আদিবাসীর ক্ষেত জমি ডুবল, ঔর আদিবাসী হাতে টাকা পেল। কোন্ আদিবাসীরা? যারা লেখাপড়া জানে। সচেত, জাগ্রত্, তশীলদার বলেছে, কোসিলা খারোয়ার খুব লিখিপড়ি আওরত। শুনেছি জওয়ানী···তেজী! উসি সে পোরমিটের মামলা শুরু হল, ঔর ও. সি. আর শ্রীবাস্তব আমাকে আইন দেখাতে লাগল। জঙ্গলের ফসলে গরিব আর আদিবাসীর অধিকার! ওরা জঙ্গল কে দাবেদার! সমঝো? আমরা···মালিকরা···কিচ্ছু নই!

কোয়ার এক চুমুক পান করেন, হেলান দেন চেয়ারে।

—স—ব কিছুর মূল ওই নয়া খেড়ি থেকে শুরু হয়েছে। শোষিত্ মুক্তি দল, নারী মুক্তি দল, স—ব! জ্বালিয়ে দাও 'নয়া খেড়ি, ইস্তাহারও জ্বলে যাবে। কিন্তু আর তো খেলা চলবে না। বহোত খেলেছে ওরা, এবার আমি খেলব। ও. সি. নয়, পুলিশ সুপার নয়, ডি. আই. জি নয়, আমি পরমাজিৎ সিং কোয়ার, উগ্রপন্থীদের বিনাশ করব।

—কৈসে হুজৌর?

—ওদের তো রক্ত গরম! ওরা আওরতের বেইজ্জতি সহ্য করবে না। বেরিয়ে আসবে। আসতে বাধ্য।

—কারা?

—উগ্রপন্থীরা···ঔর এক পেগ!

—কাল কি আমরা বেরোব?

— কালকের কথা পরে। কাল কি করব সে তো কুনারী বলে দেবে···

শেরদিল আতঙ্কিত হয়।

—কুনারী ভূঁইন, হুজৌর?

—আর কে?

—সে তো···

—কে বলল? আছে....এই জঙ্গলে আছে···সে স্বপন দেখায়··· আমার রক্ত ভুখা হয়ে যায়···ভুগা···নাংগা···চেঁচায়···আমাকে মারে ··

শেরদিল গলার কবচে হাত রাখে।

হাটের দিন নয়া-খেড়ির মেয়েরা তেত্রি ও কোসিলার নেতৃত্বে চলে যায় থানায়।

—কি হল?

কোসিলা নীরবে একটি কাগজ এগিয়ে দেয়।

—এটা দিয়ে গেলাম। যে কোনো সময়ে নয়া-খেড়ি আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের উপর অত্যাচার হতে পারে বলে আমরা ভয় করছি।

—কে ভয় দেখাল ?

তেত্রি শুকনো গলায় বলে, এখনি পরমজিৎ সিং কৌয়ারের লোকরা হাটে হুমকি দিয়ে গেল, আমাদের পাত্তল যে কিনবে তার হাত কেটে নেবে। আর নয়া-খেড়ির লোকরা জঙ্গল নষ্ট করছে। এরপর ওদের ঘর জ্বলবে, মরদরা জখম হবে, মেয়েরাও রেহাই পাবে না।

ও. সি. শুকনো ঠোঁট চেটে বলে, যখন বলছিল, তখন হাটে পুলিশ তো ছিল।

—তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

কোসিলা বলে, মৌসি, এরা তো বন্দুকও নিয়ে গিয়েছিল। যাক গে! কিছু হলে আমরা থানার প্রোটেকশান পাব ?

—"প্রোটেকশান!" আপনি ইংরিজি জানেন তবে ?

ও. সি র মন বলে, উগ্রপন্থী! উগ্রপন্থী!

—থোড়া বহোত! বাবা তো মাস্টার ছিলেন। যাহোক, আমরা জানিয়ে গেলাম। ঔর, আপনি অ্যাকশান নিন, বা না নিন, আমরা কিন্তু আমাদের রুজি ছিনাতে দেব না। আমরা কিন্তু আইন ভাঙছি না। মৌয়ার মামলাতেও আপনাদের ডেকেছিলাম।

—হ্যাঁ···নিশ্চয় প্রোটেকশান পাবেন। তখনো তো গিয়েছিলাম। কেন যে লোকটা এরকম করে!

তেত্রি সমবেদনায় বলে, তুমিও বদ্‌নসীবি বাবু! কৌয়ারের সঙ্গে বিবাদ করা···কিন্তু তুমি প্রথম পুলিশ, যার কাছে গরিব বিচার পেয়েছে।

ওরা বেরিয়ে যায়। ও. সি. কপালে হাত রেখে বসে থাকে। চাকরি ছেড়ে দেবে ? বাঘের মুখের মধ্যে মাথা রেখে চাকরি করা বড় কঠিন। গরিবের আশীর্বাদধন্য মাথাটি বড়ই বিপন্ন।

কপিল শ্রীবাস্তব এ সময়েই ঢোকে! বলে, মেয়েরা এসেছিল ?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনি এক নৌকায় ডুবছি।

—আপনিও ?

—হ্যাঁ। অক্ষরে অক্ষরে সরকারী নিয়ম মেনে চলেছি তো। ফলে জানের হুমকি খেলাম।

—কে দিল?

—শেরদিল সিং। বলে গেল জঙ্গলের ধাক্‌পাতা তোলার পারমিট দেয়া বন্ধ করুন। নইলে অঘটন ঘটে যাবে মনে রাখবেন। বলতে গেলাম, আইন যা বলে তাই করছি। বলল, আইন প্যারা না আপনার জান প্যারা, তা আপনিই বুঝবেন।

—আপনি কি....ডায়েরি করবেন?

—না। আপনাকে বিপন্ন করে লাভ কি? আমার বউকে নিয়ে যাব টাউনে।

—এখন?

—এখনি। লাস্ট বাসে।

—কোথায়?

—হাসপাতালে ডায়েটিশিয়ান আমার বন্ধু। ওর কোয়ার্টারে রেখে আসব। কাল ফিরব।

—তাই করুন।

—ডি. এম. ডি. ফরেস্টের সঙ্গে দেখা করে আসব।

—এখন না ফিরলে হয় না?

—আমাকে ফিরতেই হবে। বেচারী সরস্বতী! আবার বিধবা হবে বলে ভয় পাচ্ছে।

—আমার কোয়ার্টারে থাকবেন?

—না···ধন্যবাদ অল্‌ দি সেম! শুনুন, আপনার বউ আছে, তার বাচ্চা হবে··জাস্ট ছেড়ে চলে যান, চাই ছুটি নিন।

—আপনি ভয় পেয়েছেন!

—বিশ বছর আগে আমি এখানে, এই পোস্টে। কৌয়ার অচ্ছুত আদিবাসী মেয়ে তুলে আনত, ভোগ করত, পোষা বাঘকে খাওয়াত। কৌয়ারের কারণে এখানে প্রতিটি সৎ অফিসারকে পানিশমেন্ট পোস্টিং দেয়া হয়।

—বলবেন না···বলবেন না · আমার বমি আসছে·· ওঃ।

ও. সি. কেঁদে ফেলে। বলে, আওরতদের···ওঃ···কি পিশাচ।

—নাউ নাউ, ডোণ্ট বী আপসেট। করবে না কেন বলুন? কোন অসুবিধে হয়েছে ওর? কোনো শাস্তি দিয়েছে সরকার? সামাজিক মর্যাদা কিছু কমেছে? সরকার তো ওদের জন্যে, নাকি, বলুন?

—যান....সাবধানে থাকবেন। ওঃ কোনো শাস্তি হয় না ওদের?

—আশা করা যাক, হবে। নেভার লুজ হার্ট। চলি।

—আমি আপনার বাড়ি একটা সেপাই পাঠিয়ে দেব রাতে?

—না। শেরদিলকে আমি বিশ বছর আগেও ফুল্ ফর্মে দেখেছি। আপনার···সেপাইয়েরও তো ফ্যামিলি আছে। আর, ফরেস্ট আপিসে ফরেস্ট গার্ড তো আছে। চলি। বাস পাব না।

কপিল বেরিয়ে যায়। ও. সি. বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ায়। না, আর না। এই খোলা আকাশের নিচে, কালপুরুষ, বৃশ্চিক ও সপ্তর্ষির নিচে দাঁড়িয়ে স্বীকার করাই ভালো, পালামৌয়ে কৌয়ারের জুতোর সুকতলা হলেই যখন "পুলিশ" হিসেবে টিকে থাকা যায় ও পকেট ভারি হয়, তখন তার মতো লোক বার বার অক্ষম প্রমাণিত হবে। তার চেয়ে অনেক ভালো প্রথমে ছুটি নেওয়া, তারপর মরিয়া হয়ে কাজের খোঁজ চালানো, কোনো ভরসা পেলেই কাজ ছেড়ে দেওয়া। সে সেই পুলিশ নয়, যে বাস্তবে ও হিন্দী ছবিতে শুধুই সমাজবিরোধী, ধনী জমিদার, শেঠ, এদের চাকর ও গরিবের ভক্ষক। সে নয় সেই পুলিশ, যারা বাস্তবে সংখ্যালঘু এবং সিনেমায় "উর্দির সম্মানার্থে" জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়ে একাই অ্যাটমবোমার তেজে বিস্ফোরিত হয়ে সিঙ্গলহ্যাণ্ডেড পাপের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। না, তার ক্ষমতা খুব সীমিত। সাহসও কম। সে মনে মনে বলতে থাকে, কৌয়ার অন্য জগতের মানুষ। তার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি অক্ষম।

এখন ওর মন শান্ত হয় ক্রমে।

হেডসিপাহী, অন্য সেপাইরা, লালবদন ফিরছে।

ও. সি. টেবিলে বসে।

—আজ হাটে কি হয়েছিল ?

—আপনি তো জানেন।

—আপনারা কি করছিলেন ?

—শেরদিল বন্দুক নাচাচ্ছিল, পাত্তলের ঝুড়ি ফেলে দিল, এক মিনিটে সর্বনাশ করে চলে গেল।

—মেয়েদের সঙ্গে কথা হয়েছিল ?

—কোসিলা খারোয়ার ওকে বাপ-মা তুলে গাল দিয়েছে হজৌর। ঠিক কাজ করে নি। শেরদিল···

হেডসিপাহী আন্তরিক আবেগে বলে, এখন তো কোসিলাকে ও শিকার বানাবে, না ?

ও. সি. বলে, একটা গণ্ডগোল হলেও আমি যেন রিপোর্ট পাই। এটা অর্ডার।

—হাঁ হজৌর।

সে রাতে কিছু শোনা যায় না। আশ্চর্য নীরবতা নামে চারদিকে। ফরেস আপিসও খুবই নীরব।

কোসিলারা বলে, পাত্তল তো আমরা বেচব, জরুর বেচব।

বরজু বলে. পরের হাটে ?

—না।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কোসিলা পাতা গাঁথছিল। সে বলে, কাল আমরা সত্তর পঁচাত্তর টাকা লোকসান দিয়েছি। আজ দেব না।

—কি করবে ?

—লারাতু বাজারে যাব।

—না, ওখানে নয়।

—তবে ঝুঝার বাজারে যাব।

তেত্‌রি বলে, ওখানে বেচা যায়। কিন্তু যেতে হবে কোন পথে তা জানিস ?

—তুমি যে পথে গেলে ?

—সে তো ঘুরপথ। জঙ্গল সীমানা থেকে বেরিয়ে গেলে কোয়ারের

জঙ্গল সামান্য পাচ্ছিস। তারপর দক্ষিণে নেমে চার মাইল গেলেই···

বরজু বলে, না।

—কেন?

—কৌয়ারের জঙ্গলের পাশ দিয়ে নয়। সিধা যা, বাজার যা, যাবার পথে সকলকে ক্ষেতীজমিনে জানিয়ে যা। ফিরবি একসঙ্গে, তাও বাসে। বাসে ফরেস আপিসের কাছে নেমে যাবি, আমরা কাছে থাকব।

—আমরা একা আসতে পারব।

—না। তুই একা নোস, ফুলমোতি, পুতলা, হাজারী, আট-দশটা মেয়ে আছে, তেত্‌রি আছে। বারোটায় বেরিয়ে যাবি দুপুরে, বিকেলের মধ্যে চলে আসবি।

—তুমি···তোমরা ওখানে, তো গ্রাম পাহারা কে দেবে?

পান্না খারোয়ার বলে, সে তোর ভাবার কথা নয়। যে-যার কাজ করো। ঔর ধাক্ পাতার পাত্তল বেচা যে জঙ্গলের এক হক, সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যাচ্ছ। কোথাও ভুল করলে কোনো মেয়ের ইজ্জত যেতে পারে।

ফুলমোতি সবচেয়ে কম কথা বলে। ও বলে, আমরা খালি হাতে যাব না।

পাতলা অথচ ভীষণ ক্ষুরধার কাস্তে, অথচ ছোট।

কোসিলা বলে, ভেবো না। জাগ্‌রণের জন্য বিপদের ঝুঁকি তো নিতেই হয়। মৌসি কি যাবে?

—না। ঘরে বসে আরাম করবে। চল্ চল্, জলদি কর্। ঝুঝারে ওদের জানাও দরকার, এখন চোখ নয়া-খেড়ির দিকে।

মেয়েরা বেরিয়ে যায়। বরজু ছোট কুঠার বা কুলাড় নিয়ে তেত্‌রির ঘরে বসে থাকে। কুনারী ভূঁইন ফিরে আসছে এতকাল বাদে। তারও তো অনেক ভুখ মিটে নি। বিশালকে নিয়ে সংসার করার ভুখ, সন্তান পালনের ভুখ, আরো সন্তান ধারণের ভুখ, অনেক ক্ষুধা মেটে নি তার।

বরজুর ঘর দেখে বলেছিল, যখন থাকতে আসব, দেয়ালে চিত্র করে নেব।

বরজুও তো কোনো ক্ষুধার তাড়নেই এখানে ঘুরে এসেছে। ক্ষুধা এতরকম হয়।

একটা ঘটনা ঘটে যদি, তখন তো বিন্দা সিংদের বেরিয়ে এসেই লড়াই করতে হবে।

বরজুর বারবার কৌয়ারের জঙ্গলের কথা মনে হয়। প্রতিটি রমণীকে ও জঙ্গলে এক বিশেষ জায়গায় নিয়ে যেত। শিকারখানার কাছের চাতালে। বরজু ছাড়া সে পথ কে জানবে? কৌয়ার! কৌয়ার! এতকাল বাদে!

ঝুঝার মাঠে কর্মরত নারীপুরুষদের কাছে তেত্‌রিরা বলতে বলতে যায়। কোসিলা বিরজিয়া বলে, চল্ আমিও যাই। বাজারের খদ্দেরদের চিনিয়ে দিই।

তেত্‌রি বলে, হরনাম সিংকে জিজ্ঞেস করব, পাত্তল কেউ কিনবে কিনা।

—প্রথমে মৌয়ার লড়াই, এখন পাত্তলের লড়াই, বিড়িপাতার লড়াইটাও তো লাগবে।

—নিশ্চয়। আর সব লড়াই জারিও থাকবে মৌসি, কৌয়াররা কি সহজে ছেড়ে দেবে?

—তবে জারি থাকবে।

—এরা আর কোনো জুলুম করেছে?

—ফসল পেকে আসছে। এখন নয়া জুলুম করবে না। লোক পাবে কোথায়? তবে জরুর জুলুম করবে।

ঝুঝার বাজার যথেষ্ট গঞ্জ জায়গা। বাস রোডের ওপরে। দূরপাল্লার বাসের যাত্রীরা এখানে নেমে দিনে ও রাতে দোকানে খেয়ে নেয়। ধাক্ পাতার পাত্তল ও বাটিই অধিকাংশ লোকের পছন্দ।

ঘুরে ঘুরে ওরা বিক্রি করে। "সাত টাকা হাজার" বলেই দোকান-মালিক কোসিলা বিরজিয়ার দিকে চায়। বলে, না না,

নয় টাকা। এদেরও তাই দিয়েছি। আর বাটি নিয়েছি আট টাকা হাজার।

কোসিলা খারোয়ার বলে দাম বাড়াতে হবে। পনেরো-বিশ টাকা যদি না নিয়ে যায়, খাটান পোষাবে কেন?

ওরা যে-যার টাকা নিয়ে পেটকাপড়ে বাঁধে। কোসিলা খারোয়ার ভাবে, এভাবে ইজ্জতরক্ষার লড়াই ঘনিয়ে তুলবে কৌয়ার, এটা ভাবা উচিত ছিল। বরজু যথেষ্ট অভিজ্ঞ লোক, মাটির মানুষ, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এভাবে লড়িয়ে হয়ে উঠুক। অনেক বরজু, অনেক তেত্রি, অনেক কোসিলা বিরজিয়া দরকার এখন।

দোকানে ওরা চা, পকোড়া ও জল খায়। তারপর বসে পথের ধারে।

—বাস কখন আসবে মৌসি?

—পাঁচটার পর। ওই বাসই ছ-টার পর ছাড়বে লারাতু থেকে।

পাঁচটা বাজে প্রায়। ওরা সেদিক পানে তাকায়। ব্যস্ত, অতি ব্যস্ত পথ। ট্রাক, ম্যাটাডোর, সাইকেল, স্কুটার. হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে একটি গাড়ি থামে ওদের সামনে। ওদের মুখে ধুলো লাগে।

কোসিলা ছিটকে ওঠে, দেখতে পাচ্ছ না? চাপা দেবে নাকি? কি ভেবে···

ওর কথা শেষ হতে পায় না। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে তড়িৎ-গতিতে নামে শেরদিল সিং, এবং কোসিলাকে পাঁজাকোলা করে ধরে গাড়ির মেঝেতে ফেলে, দরজা বন্ধ করে। গাড়ি বেরিয়ে যায়।

খোলা বাজারে এত লোকের সামনে এমন ঘটনা এ অবধি পালামৌয়ের ইতিহাসে ঘটেনি।

—আরে কৌয়ারের লোক লেড়কি তুলে নিয়ে ভেগে গেল···আরে কৌয়ারের লোক···একটা কিছু করো!

ওদের চেঁচামেচিতে লোকজন বেরিয়ে আসে, তারা বলে, কি হল?

তেত্রি একইভাবে চেঁচিয়ে চলে, চেঁচিয়ে বলে, এতগুলো মরদের

সামনে থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে গেল···হায় হায়!···তুলে নিয়ে গেল....

—লারাতু থানায় চলে যাও বুড়ীয়া···

—হায় কোসিলা···অব কা হোই?

কোসিলা বিরজাইন তেত্‌রিকে টানে ও ঝুঝার পানে ছুটতে থাকে। তেত্‌রি বলে, আমরা চলে যাই নয়া-খেড়ি।

—যা! যা! কোসিলা! ঝুঝারওয়ালাদের বল্!

—আব তো জ্বালা দি' কাছারি।

—আমরা চলে যাই···পুতলা, ফুলমোতি! আমার পিছনে আয়। অন্য পথে যাব!

—অব তো কোই ন রুখে হমকো···হায় কোসিলা! এ কি হল?

পুতলা বলে, অব ন চিল্লা মৌসি! দম ছুট যায়ে গা! তেত্‌রি নিমেষে মুখ বন্ধ করে ও ছুটতে থাকে, ছুটতে থাকে।

বাস এসেছিল, ওরা আসে নি। ছেলেরা তেত্‌রির ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

তেত্‌রিরা ওদের সামনে তীরবিদ্ধ বাজপাখির মত আছড়ে পড়ে ও বলে, ঝুঝার বাজায় সে শেরদিল সিং কোসিলা কো উঠা লী, ঔর মটর মেঁ উঠাই, ঔর ভাগি।

বরজু সগর্জনে বলে, কখন?

—পাঁচ বাজে!

বরজু কুলাড় তুলে নেয়, দেশলাই ও কেরোসিনের বোতল।

—চলো! হম্ চলে তেত্‌রি, তু যাকে থানা মেঁ রিপোর্ট কর্।

কপিল শ্রীবাস্তব দাঁড়িয়েছিল। সে বলে, জল খেয়ে নাও তেত্‌রি আমার সঙ্গে চলো।

—বরজু!

—বরজু জানে অব্ কৌয়ার কা করে গা। আর কেউ জানে না। চলো ববুয়ারা!

সরকারী জঙ্গল পাহাড়ের গায়ে পিছলে বরজু পাথরের মতই গড়িয়ে নামে। ওর মুখ পাথর কঠিন, ভুরু ও চোখ কোঁচকানো। চাপা গলায় বলে, হুঁশিয়ার সে। এ জায়গা বহোত হি খতরনাক। আমরা কৌয়ারের জঙ্গলে ঢুকছি। আমার পিছনে এসো।

—পথ কোথায়?

—সব আছে। এ তো একটা টুকরা মাত্র, জঙ্গল অনেক, অনেক বড়। ভয় নেই কুনারী, আমি আসছি।

উন্নত শালগাছের অভিজাত গর্বোদ্ধত মাথা। বরজু বলে, শালের পর ইমলি, তারপর কেঁদ, তারপর কুসুম, তারপর ধাক্, পর পর জঙ্গল। এখানে শুধুই শাল। দামী গাছ, বাড়ির কাছে। ইধরসে, ইধরসে···

বরজু দাঁড়ায়। বলে, কৌয়ার আমার শিকার।

—কিন্তু কেন?

—কুনারীকে লিয়ে।

—শেরদিলরা?

—সামনে থাকবে না। আঃ, ওহি শিকারখানা···ওই ঘরে আমি থাকতাম। দাঁড়াও!

কান পাতে ও।

—শুনতে পাচ্ছ?

—কি?

—কৌয়ার শিকার খেলছে। মেয়েদের ছুটিয়ে ছুটিয়ে যখন মেয়েটা আর পারে না, তখন ধরে।

পাতায়, জমে থাকা পাতায় পায়ের শব্দ। একজনের পায়ে শুধু পাতা মাড়াবার শব্দ, আরেকজন নাগরা জুতোয় পাতা মাড়াচ্ছে।

—ওহি চাতাল!

বরজু ভীষণ গর্জনে চেঁচায়, কো—সি—লা! ভয় নেই কোসিলা।

শুকনো পাতায় কেরোসিন ছড়ায় ও দেশলাই ঠোকে।

পাতা ধা ধা করে জ্বলে ওঠে।

কোসিলার পরনে শাড়ি নেই, গায়ে নেই জামা। সায়া পরে দু' হাত আড়াআড়ি রেখে বুক ঢেকে ও ছুটছে।

ধকধকে আগুন, ধোঁয়া, কোসিলাকে জাপটে ধরে ঠেলে দেয় বরজু পিছনে।

তারপর কুলাড় মাথার উপর তুলে বরজু উন্মাদ উল্লাসে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচায়, কৌয়া-য়া-য়া-র! ও সামনে আগায়।

আগুনের আভায় ধৃত পরমেশ্বরজিৎ সিং কৌয়ারের ছবি।

··ব··র—জু!

কথা না বলে সমান গতিতে দৌড়ে গিয়ে কুলাড় বসিয়ে দেয় বরজু ভুঁইয়া।

—এটা কুনারীর জন্যে! এটা তার বাচ্চার জন্যে! এটা বিশালের জন্যে! এটা খেড়া গ্রামের জন্যে!

বরজুকে কোনো সচল পাহাড়ের মত দেখায়। পাহাড় কাঁপছে, বিস্ফোরিত হচ্ছে।

—এসো, এসো বরজু!

—ভাগ যা, ভাগ যা বিশাল, কুনারীকে নিয়ে। ভাগ যা।

—চলে এসো।

—ভাগ যা।

কৌয়ার মহলের দিক থেকে মানুষ ছুটে আসার শব্দ।

অন্ধকারে কয়েকটি মানুষ কাঁধে একটি অচৈতন্য মেয়েকে নিয়ে পালায়।

বরজু কুলাড়টা তুলে নেয়। সেও মিশে যায় আঁধারে।

পাতা অনেকদিন শুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। আগুন ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে।

বরজু অন্ধকারে শিকারী চিতার মত ছোটে। আর শেরদিলরা থমকে দাঁড়ায়।

কৌয়ারকে ঘিরে এক অগ্নিবলয় ভীষণ ক্ষুধায় তাঁর দিকে এগোচ্ছে। আগুন আজ ক্ষুধার্ত। এই প্রথম পালামৌয়ের আগুন হরিজন বা আদিবাসীকে খাবে না। উচ্চবর্ণ রাজপুতকে খাবে বলে পালামৌয়ের আগুনের আজ ভীষণ ক্ষুধা।